ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 17, No. 1, June 2020

S R Lahiri Mahavidyalaya
University of Kalyani
West Bengal

ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas
Volume 18, No. 1, June 2020

'Open Eyes' is a multidisciplinary **peer reviewed journal** published biannually in June and December since 2003. It is published by the Principal, Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, University of Kalyani, West Bengal, India on behalf of the Seminar & Research Forum. Contributed original articles relating to Social Science, Literature, Commerce and Allied Areas are considered for publication by the Editorial Board after peer reviews. The authors alone will remain responsible for the views expressed in their articles. They will have to follow styles mentioned in the 'information to the contributors' given in the inner leaf of the back cover page of this journal or in the website. All editorial correspondence and articles for publication may kindly be sent to the Jt. Editor(s).

Advisory & Editorial Board

Professor (Dr.) Barun Kumar Chakroborty
Emeritus Professor, Rabindra Bharati University, Kolkata, India.
& Ex. Professor, Department of Folklore, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Tapas Basu
Ex. Professor, Department of Bengali, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Apurba Kumar Chattopadhyay
Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (A Central University), West Bengal, India.

Professor (Dr.) Jadab Kumar Das
Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata, India.

Professor (Dr.) Md. Mizanur Rahman
Department of English, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

Dr. Biswajit Mohapatra
Department of Political Science, North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya, India.

Dr. Paramita Saha
Department of Economics, Tripura University (A Central University), Tripura.

Dr. Prasad Serasinghe
Department of Economics, Faculty of Arts, University of Colombo, Sri Lanka.

Jt. Editor

Dr. Bhabesh Majumder
(bhabesh70@rediffmail.com)

Shubhaiyu Chakraborty
(shubhaiyu007@gmail.com)

Contents

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলনের ভূমিকা : শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে

শিউলি বসাক ৩

রবীন্দ্রনাথ ও সূফীতত্ত্ব

তনুকা চৌধুরী ১৮

মহাশ্বেতা দেবীর মাস্টার সাব : প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর

চঞ্চল মণ্ডল ২৪

মুর্শিদাবাদ : ঐতিহাসিক জেলার অঐতিহাসিক জরি শিল্প

অলোককুমার বিশ্বাস ৩২

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন : প্রেক্ষাপট আন্দামান

সৌমেন মুখোপাধ্যায় ৩৭

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন : বাংলা উপন্যাস

মণিশঙ্কর অধিকারী ৪৬

একুশ শতকের বাংলা পত্র-পত্রিকায় চৈতন্যচর্চা

শ্রীবাস বিশ্বাস ৫১

Refugee Rehabilitation in Nadia District

Subhas Biswas 60

Green Accounting, Its Reporting Practices and the Sustainable Development Goals : An Indian Perspective

Somnath Bandyopadhyay 66

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলনের ভূমিকা : শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে

শিউলি বসাক

যুগে যুগে সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলনে বারবার আন্দোলিত হয় সমাজ; আর সমাজের দর্পণে অর্থাৎ সাহিত্যে তা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এই আন্দোলন যখন হয় সাহিত্যেই, তখনই সাহিত্যধারায় আসে এক-একটি বাঁকবদল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি পাকাপোক্ত ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠার পরে, বড়সড় বাঁকবদলটি হয়েছিল বিশ শতকের ত্রিশের দশকে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির তরুণ লেখকদের হাত ধরে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত অসংখ্য সাহিত্য-আন্দোলনের ঢেউ মতবাদরূপে এইসময়ে এদেশে পৌঁছে বাংলা সাহিত্যকে নব নব রূপ দিয়েছে। এরপর পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-আশির দশকে বাংলা সাহিত্য-জগতে এমন কিছু যৌথ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, যেগুলি কোন বিদেশি সাহিত্য-আন্দোলনসঞ্জাত নয়, এদেশের সাহিত্য-ভূমিতেই যাদের উৎপত্তি। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ছোটগল্পের যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার মূলে ছিল বিমল করের 'ছোটগল্প-নূতনরীতি' গল্প-আন্দোলন। এরপর একের পর এক হাংরি আন্দোলন, নিমসাহিত্য আন্দোলন, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন, ধ্বংসকালীন আন্দোলন, নতুন-নিয়ম আন্দোলন, ছাঁদ-ভেঙে-ফেল আন্দোলন, চাকর সাহিত্যবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি আন্দোলনগুলি ষাট-সত্তর-আশির দশকে বাংলা সাহিত্য-জগতে এক একটি তরঙ্গ তুলেছিল। বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে ঘোষিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই আন্দোলনগুলির প্রতিক্রিয়ায় প্রত্যাখ্যানও প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে। মূলধারার সাহিত্য পাঠককে যে স্থিতাবস্থার মধ্যে আটকে রাখে এই সাহিত্য সেই স্থিতাবস্থাকেই ভাঙতে চেয়েছিল নানাভাবে। ইতিহাস তো রচিত হয় রূপান্তরের হাত ধরেই। সাহিত্যের ইতিহাসও এভাবেই এগিয়ে চলে। শৈলীবিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনসঞ্জাত সাহিত্যের প্রকৃত ভূমিকা নির্ণয় করাই এই গবেষণা-নিবন্ধের অন্বিষ্ট।

১

শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলনের মুখপত্ররূপ পত্রিকা 'এই দশক'-এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ পায় ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে। তবে এই আন্দোলনের সূত্রপাত আসলে আরও কয়েক বছর আগে। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে রমানাথ রায়ের সম্পাদনায় 'এই দশক' নামে একটি বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছিল। এই বুলেটিনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তরুণ কবি ও গল্পকারদের একটি দল। সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ছাপা হতো এই বুলেটিনে। ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত মোট নয়টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। এরপর এই বুলেটিনের সঙ্গে যুক্ত কবি ও গল্পকাররা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান। এই কবিরাই ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে 'শ্রুতি' নামে একটি কবিতা-পত্রিকা প্রকাশ করে শ্রুতি আন্দোলন শুরু করেন। অন্যদিকে, 'এই দশক' বুলেটিনের সঙ্গে যুক্ত গল্পকাররাই ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে 'এই দশক' পত্রিকা প্রকাশ করে শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। ষাটের দশকে শুরু হয়ে এই আন্দোলন আশির দশককেও ছুঁয়ে গিয়েছে। সমসাময়িক সাহিত্য আন্দোলনগুলির বয়সের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় যে, শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলন একটি অন্যতম দীর্ঘায়ু সাহিত্য-আন্দোলন। 'এই দশক' পত্রিকার মোট সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল চব্বিশটি[১]—

১. 'এই দশক' প্রথম সংকলন, ফাল্গুন ১৩৭২
২. 'এই দশক' দ্বিতীয় সংকলন, আষাঢ় ১৩৭৩
৩. 'এই দশক' তৃতীয় সংকলন, পৌষ ১৩৭৩

বসাক, শিউলি : বাংলা ছোটগল্পের ধারায় শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলনের ভূমিকা : শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 1, June 2020, Page : 3-17, ISSN 2249-4332

৪. 'এই দশক' চতুর্থ সংকলন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪
৫. 'এই দশক' পঞ্চম সংকলন, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪
৬. 'এই দশক' ষষ্ঠ সংকলন, বৈশাখ ১৩৭৫
৭. 'এই দশক' সপ্তম সংকলন, শ্রাবণ ১৩৭৫
৮. 'এই দশক' অষ্টম সংকলন, পৌষ ১৩৭৫
৯. 'এই দশক' নবম সংকলন, বৈশাখ ১৩৭৬
১০. 'এই দশক' দশম সংকলন, ভাদ্র ১৩৭৬
১১. 'এই দশক' একাদশ সংকলন, মাঘ ১৩৭৬
১২. 'এই দশক' দ্বাদশ সংকলন, আষাঢ় ১৩৭৭
১৩. 'এই দশক' ত্রয়োদশ সংকলন, কার্তিক ১৩৭৭
১৪. 'এই দশক' চতুর্দশ সংকলন, বৈশাখ ১৩৭৮
১৫. 'এই দশক' পঞ্চদশ সংকলন, ১৩৭৮
১৬. 'এই দশক' ষোড়শ সংকলন, বৈশাখ ১৩৭৯
১৭. 'এই দশক' সপ্তদশ সংকলন, অগ্রহায়ণ ১৩৭৯
১৮. 'এই দশক' অষ্টাদশ সংকলন, মাঘ ১৩৮০
১৯. 'এই দশক' ঊনবিংশ সংকলন, ১৩৮১
২০. 'এই দশক' বিংশ সংকলন, মাঘ ১৩৮১
২১. 'এই দশক' একবিংশ সংকলন, ১৩৮২
২২. 'এই দশক' দ্বাবিংশ সংকলন, তারিখহীন
২৩. 'এই দশক' ত্রয়োবিংশ সংকলন, তারিখহীন (১৯৭৮?)[২]
২৪. 'এই দশক' চতুর্বিংশ সংকলন, তারিখহীন (১৯৮১?)[৩]

'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি ছিল প্রচ্ছদে ছাপানো স্লোগানধর্মী কয়েকটি কথা।[৪] যেমন—

১. গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব।
২. আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত।
৩. অতীতের সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ, আমাদের কাছে নয়।
৪. গল্পে এখন যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে।

নবীন তেজের ঈষৎ ঔদ্ধত্য পত্রিকার পৃষ্ঠায় ঘোষিত হয়েছে। প্রচলিত বাংলা সাহিত্যে অনুসৃত ও চেনা যাবতীয় চলনভঙ্গিকে অস্বীকার করে, প্রচলিত সব শর্তকে নস্যাৎ করে এই লেখকেরা নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন পথে এগিয়েছেন। 'গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব'—এই 'আমাদের কথা' হল অন্তর্জগতের কথা। অন্তর্জগতের জটিল অনুভবই শাস্ত্রবিরোধী গল্পের বিষয়। 'আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত'—শাস্ত্রবিরোধী গল্প কী তাহলে অবাস্তবতার কথা বলে, এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু আদৌ তা নয়। তাঁরা বলেন অন্তর্বাস্তবতার কথা। শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার শেখর বসু বলেছেন—

> শাস্ত্রবিরোধী লেখকেরা ছিলেন গভীরভাবে অন্তর্মুখী। বিশ্বাস করতেন, বাইরের চমকপ্রদ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক নেই। .... আমরা বিশ্বাস করতাম—বাইরের বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জ সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে না। আমরা আমাদের গল্পে ঘটনার ঘনঘটা থেকে দূরে থাকতাম সচেতন ভাবে। সচেতন ভাবেই তথাকথিত বাস্তবতার চর্চা করিনি।[৫]

এঁরা সচেতনভাবেই সমাজক্ষুব্ধতা ও পরিপ্রেক্ষিতকে এড়িয়ে গিয়েছেন। এঁরা কম বেশি কলাকৈবল্যবাদী। 'অমল চন্দকে

যে ভাবে জেনেছি' শীর্ষক প্রবন্ধে অতীন্দ্রিয় পাঠক বলেছেন, "ব্যক্তিগত আলোচনায় অমল চন্দকে যে ভাবে জেনেছি, তা হল, তিনি ছিলেন বাম-রাজনীতির সমর্থক, অথচ তাঁর লেখায় কোথাও তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।"[৬] তৃতীয় বক্তব্যটি আর্তোর বিখ্যাত উক্তি "Masterpieces of past are good for the past, they are not good for us."-এর অনুবাদ।[৭] পুরনোকে বর্জন করে নতুনকে গ্রহণ করার কথা বলেন শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা। চতুর্থ বক্তব্যটি ছাপা হয়েছিল মার্ক টোয়েনের অনুসরণে। 'The Adventures of Huckleberry Finn' গ্রন্থের শুরুতেই মার্ক টোয়েন একটি নোটিশ ছেপেছিলেন। তাতে লেখা ছিল—

> Persons attempting to find a motive in this narrative will be prosecuted ; persons attempting to find a moral in it will be banished ; persons attempting to find a plot in it will be shot.[৮]

শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার রমানাথ রায় পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"পত্রিকার প্রচ্ছদে মার্ক টোয়েনকে কাজে লাগিয়েছিলাম। 'হাকলবেরি ফিন'-এর শুরুতে পাঠকদের উদ্দেশ্যে যে নোটিশ লেখক দিয়েছিলেন তার থেকে একটা অংশের পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি বাক্য ব্যবহার করেছিলাম। বাক্যটি এই—'গল্পে এখনো যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে।' সত্যি বলছি কাউকে গুলি করার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। কেবলমাত্র পাঠকদের সঙ্গে একটু ইয়ার্কি মারার জন্য বাক্যটি ছাপিয়েছিলাম। .... এই মজার বাক্যটি সেই সময় চারদিকে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। আমাদের ওপর অনেকে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। অনেকে আবার মজাও পেয়েছিলেন।"[৯] 'শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্প এবং দশটি ঘোষণা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে রমানাথ রায় শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের দশবিধি নির্দেশ করেছেন।[১০] এই সব জোরদার ঘোষণায় বাংলা ছোটগল্পের প্রবহমান গতানুগতিকতাকে জেরবার করে দিয়ে তাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন এক নতুন সম্ভাবনার পথে। শাস্ত্রবিরোধিতা বলতে এই গল্পকারেরা ঠিক কী বুঝিয়েছেন, তা সম্পর্কে একজন অন্যতম শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার শেখর বসু বলেছেন—

> এই শাস্ত্র বলতে ধর্মশাস্ত্র নয়। শিল্প-সাহিত্যের গোঁড়া, সংস্কারাচ্ছন্ন, অবশ্য-পালনীয় নিয়মাবলীকেই এখানে শাস্ত্র বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই শাস্ত্র শিল্প-সাহিত্যের পথ উন্মুক্ত করার বদলে রুদ্ধ করে। এই শাস্ত্র শাস্ত্রবিরোধীরা মানেন না। নতুন-নতুন পথ খোলার স্বার্থেই মানেন না।[১১]

'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (মার্চ, ১৯৬৬) মোট পাঁচজন গল্পকারের গল্প দিয়ে শাস্ত্রবিরোধিতার সূত্রপাত ঘটে। এই পাঁচজন হলেন—সুব্রত সেনগুপ্ত, রমানাথ রায়, শেখর বসু, কল্যাণ সেন এবং আশিস ঘোষ। পরবর্তীকালে আরও তিনজন এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁরা হলেন—অমল চন্দ, বলরাম বসাক ও সুনীল জানা। 'এই দশক'-এর পাতায় তাঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটে যথাক্রমে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও অষ্টম সংখ্যায়। শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল মূলত এই আটজন গল্পকারকে নিয়েই। এছাড়া আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও, শাস্ত্রবিরোধীদের মানসিকতার কাছাকাছি—এমন বেশ কিছু গল্পকারদের গল্প ছাপা হয়েছিল 'এই দশক' পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—অশোককুমার দাস, মনোমোহন বিশ্বাস, সমর মিত্র, কুমারেশ নিয়োগী, প্রিয়ব্রত বসাক, দেবশ্রী দাস, তপনলাল ধর, সুকুমার ঘোষ, মোহিত চক্রবর্তী, অরুণেশ ঘোষ, রথীন ভৌমিক, উদয় ভট্টাচার্য, দেবীপদ মুখোপাধ্যায়, অতীন্দ্রিয় পাঠক প্রমুখ। এই নিবন্ধে মূল আটজন শাস্ত্রবিরোধী লেখকের গল্পের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হল।

২

"না আর গল্প নয় গল্প বলতে পারব না
আমি কথা বলতে পারি কথা বলব।"[১২]

ষষ্ঠ সংকলনে প্রকাশিত 'কথা' গল্পের প্রথম বাক্যে রমানাথ রায় একথা বলেছেন। এটিই তাঁর অন্যান্য গল্পেরও মূলকথা।

কেবল তাঁর নয়, সমস্ত শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদেরই একই বক্তব্য। শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা আদ্যন্ত গল্প বলার শৈলী পরিহার করে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি যখন এত মিশ্র, জটিল ও অনির্দিষ্ট, তখন গল্পে কীভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়, নির্দিষ্ট সমস্যা থাকতে পারে। কখনো কেবলমাত্র ইমেজকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু চিত্রের সমষ্টি হয়ে উঠল গল্প। আবার কখনো, কোন এক মুহূর্তের বিশেষ কোন ভাবনার অংশ-বিশেষই গল্পকার পাঠকের কাছে পরিবেশন করলেন। গত শতকের তিন-চারের দশকে ছিল বিষয়ের বৈচিত্র্য। আর শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা নির্দিষ্ট বিষয়কেই অস্বীকার করলেন। যেমন ধরা যাক, রমানাথ রায়ের 'গিলিগিলি' গল্পটি। গল্পটির বিষয় কী, সেটা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কাহিনি-লোভী পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারে না রমানাথ রায়ের 'বলার আছে', 'গোগা', 'কোকো', 'গিলিগিলি', 'লোলা বিয়ার খায়', 'জাল কলকাতা' ইত্যাদি গল্প। শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলি প্রচলিত বাংলা গল্পের বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করে মনন, অনুভূতি ও বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনাকে প্রতিফলিত করতে থাকে। সুতরাং, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও গল্পগুলি অন্য এক জগতের বার্তা নিয়ে আসে, সেই জগৎ বহির্জগৎ নয়, মানুষের অন্তর্জগৎ। রমানাথ রায় বলেছেন—''শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা গদ্য কেবলমাত্র বাস্তববাদী সাহিত্যের ধারাতেই রচিত হতে থাকে। কে কত বাস্তব গল্প লিখতে পারেন তারই প্রতিযোগিতা যেন শুরু হয়ে যায়। ভয়াবহ দারিদ্র্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়, যৌনবিকৃতি গল্পের বিষয় হয়ে ওঠে। চরিত্রকে জীবন্ত করার তাগিদে চরিত্রদের মুখে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের প্রাবল্য দেখা দেয়। বহির্জগতের ঘটনাই গল্পে গুরুত্ব পেতে থাকে। অন্তর্জগতের কথা বহির্জগতের চাপে হারিয়ে যায়। .... তাঁরা ভুলে গেলেন মানুষের প্রকৃত পরিচয় বহির্জগতে নেই, আছে অন্তর্জগতে। আছে তার মনে।''[১৩] সুব্রত সেনগুপ্তের গল্পগুলোতে যেমন 'চারিদিকে', 'জামা' বা '২০০০ অপমান' ইত্যাদি গল্পে বাইরের ঘটনা খুব সামান্যই। তবে সামান্য এই ঘটনাই বড় মাপের একটি সংঘাত তৈরি করে অন্তর্জগতে। গল্পগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে, এই গল্পগুলির বিষয় প্রথাবদ্ধ গল্পের বিষয়ের থেকে কতটা দূরবর্তী।

অন্তর্বাস্তবতার কথা বলতে বলতে গল্প কখনো কখনো হয়ে ওঠে আত্ম-অন্বেষণের গল্প, নিজেকে খোঁজার গল্প। রমানাথ রায়ের 'বলার আছে' গল্পের 'আমি' যখন কিছু বলার অনেক চেষ্টা করেও বলতে পারে না, তখন ঠিক করে—''আমি লিখব লিখেই সব বলব।''[১৪] অথচ লেখার সময় দেখা গেল—

> ' কাগজগুলো ড্রয়ার থেকে বেরিয়ে পড়ল শূন্যে ভাসতে লাগল
> কলম ড্রয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ল শূন্যে ভাসতে লাগল
> ওদের ধরতে গিয়ে আমার ডান হাত খসে গেল
> ওদের ধরতে গিয়ে আমার বাঁ হাত খসে গেল
> উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আমার দুপা খসে গেল
> সব আলাদা হয়ে গেল
> সব শূন্যে উঠে গেল
> সব ভাসতে লাগল।''[১৫]

এই একই বয়ান পাওয়া যায় সমকালীন হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সুবিমল বসাকের লেখায়—''একেক সময় আমার মনে হয়, আমার য্যান কিচ্ছু নাই—শরীরের চামড়া হাড়গোড় মাথা বুক বেবাক কিছু গতর থিক্যা আলগা হইয়া ইদিক-উদিক ছিতরাইয়া আছে। আমার ভিতরে তখন আর আমারে পাই না। নিজেরে তন্নি তন্নি কইর‍্যা বিচড়াইতে থাকি ....''[১৬]। সুব্রত সেনগুপ্তের 'জামা' গল্পেও কথক বলেছেন—''নতুন জামা পরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আধ শোওয়া অবস্থায় আমি আমার হাত পা খুঁজতে লাগলাম। খুঁজে পেলাম না।''[১৭]

আবার শেখর বসুর 'সমতল' গল্পে দেখি সম্পর্কের ভিতরে সম্পর্কহীনতা। পাঁচজন পাহাড়-ভ্রমণে গিয়ে চারজন পরস্পরের সঙ্গে অতীত পাল্টাপাল্টি করে নেয়—সুখেন্দু-প্রণব, মিহির-অমর। কেবল শিবানীর অতীত বদল করা হয় না।

বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘোরার সময় নতুন সুখেন্দু ও শিবানী আলাদা হয়ে যায়। নতুন প্রণব অর্থাৎ আসল সুখেন্দু তাদেরকে খুঁজতে যায়, তাদের ফিরে আসাটা অমর-মিহিরের বয়ানে এরকম—"হঠাৎ ছপ ছপ শব্দ হল। .... শিবানী একদম শেষে। এই সামান্য পথটুকু আসতে তিনজনের যেন অনেক সময় লাগল। 'এত দেরি কী .... ।' কথাটা শেষ হল না। তিনজনের মুখই অসম্ভব থমথমে। কাছে দাঁড়িয়ে থেকে দূরে কিংবা পায়ের গোড়ায় দৃষ্টি। শিবানীর আঁচলের একফোঁটা জল পাথুরে মাটিতে মিশে গেল।"[১৮] পাহাড় থেকে নামার সময়—"শুধু জুতোর শব্দ, লাঠির ঠকঠক্, নুড়ি গড়ানোর আওয়াজ। কারও মুখে কোন কথা নেই। একটা সিগারেট জ্বলল। অন্যবার একটা জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনটে কিংবা দুটো ধরত। এবার শুধু একটা পুড়তে লাগল।"[১৯] পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে—কেবল সিগারেট নয়, সিগারেটের মালিকও পুড়তে থাকে ভেতরে ভেতরে।

একাকিত্ববোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ অর্থাৎ এলিয়েনেশ এই গল্পসম্ভারে পাওয়া যাবে। কল্যাণ সেনের 'বাইরে থেকে' গল্পে বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি তপন বলে একজনকে ক্রমাগত ডাকতে থাকে। মানুষটির ডাক, গেটের শব্দ, আশপাশের লোক জড়ো হওয়া, টুকরো টুকরো কথা, কুকুরের ডাক, দপ দপ করা লাইট পোস্ট—ইত্যাদি বর্ণনা চলতে থাকে। কিন্তু তপন নামের কেউ গেট খোলে না। সব আর্তি, সব ব্যাকুলতা ব্যর্থ হয়। লেখক এই ভাবে সাড়া না পাওয়া মানুষটিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেন। 'শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার কল্যাণ সেন' শীর্ষক প্রবন্ধে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন, "যে পাঠক মানুষের একাকিত্বের কষ্টলাঞ্ছিত অনুভূতিকে ভাষার অবয়বে স্পর্শ করতে চান, তিনি গল্পটিকে সহজে ভুলতে পারবেন না।"[২০] গল্পটির প্রতিটি বাক্যেই নির্বিকার উচ্চারণ। প্রতিটি বাক্যেই কথক আবিষ্কার করেছে সে একা। যেন এক ক্লান্তি, বিষাদ, অসহায়তা। পাঠককেও সন্ত্রস্ত হতে হয়, সত্যিই কি কেউ আছে তার? আবার অমল চন্দের 'বারান্দা' গল্পে একজন প্রায় ঘরবন্দী, সে কেবল ভাবে বারান্দাতে যাবে, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না। 'অমল চন্দকে যে ভাবে জেনেছি' শীর্ষক প্রবন্ধে অতীন্দ্রিয় পাঠক বলেছেন, "তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা প্রত্যেকেই একাকিত্বের শিকার, জাগতিক সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে দিশেহারা।"[২১]

আশিস ঘোষের 'সাইকেল' গল্পে একজনের কথা বলা হয়েছে—"তিনি মোটর সাইকেল চালান। চালাতে ভালোবাসেন। যেখানে যত রেস্ হয়, তাঁকে ঠিক দেখা যায়। কিন্তু ফার্স্ট হওয়া তো দূরের কথা, কেউ তাঁকে কোন দিন কোন পুরস্কার পেতেও দেখেনি। তবুও তিনি চেষ্টা ছাড়েননি।"[২২] বারবার ব্যর্থ হয়েও চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার গল্প এটি। এভাবেই শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা গল্পের ছোট পরিসরে আমাদের অন্তর্বাস্তবতার কথা নানাভাবে বলে গেছেন। 'পঞ্চাশৎ পরিক্রমা' গ্রন্থে সমরেশ মজুমদার 'ছোটগল্প ২' শীর্ষক প্রবন্ধে শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেছেন—"অন্তর্বাস্তবতার একটি ধারা গল্পে যোজিত হল, এগুলি 'Single sitting' বড়ো জোড় Poe-এর a prose narrative requiring from half an hour to one or two hours for its perusal."[২৩]

৩

> শিল্প সৃষ্টির অন্যতম উপাদান যে ভাষা তা প্রায়ই অযথার্থ ও সংকীর্ণ, আমাদের মিশ্র অস্পষ্ট অনুভব প্রকাশে অক্ষম মনে হয়।[২৪]

'এই দশক' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে সুব্রত সেনগুপ্ত বলেছিলেন একথা। বহু ব্যবহারে শব্দের জীর্ণতা ও মলিনতা তাঁদেরকে ব্যথিত করেছে, বিক্ষুব্ধ করেছে। শব্দকে নির্দিষ্ট কোনো অর্থে বেঁধে না রেখে তার বিস্তার ঘটিয়েছেন। তাঁরা পুরনো শব্দকে বারবার নতুনভাবে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, নতুন অর্থে বুঝতে চেয়েছেন। আবার কখনো আপাত অর্থহীন শব্দ-প্রয়োগে অর্থের নাগাল পেতে চেয়েছেন। তাই তাঁদের বেশ কিছু গল্পে দেখা যায় চরিত্রদের নাম, স্থানের নাম বা গল্পেরও নাম আমাদের পরিচিত নয় ঠিক। অর্থহীন চরিত্রনাম ব্যবহার করে তাঁরা আসলে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন চরিত্রগুলির অন্তর-ধর্মে এবং সেই সূত্রেই চরিত্রগুলিকে বিশিষ্ট করে তুলেছেন। অমল চন্দের একটি গল্পের নাম 'নাম পাচ্ছি না'। এই গল্পে চরিত্রদের নাম ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ। রমানাথ রায়ের গল্পের নাম '! !', 'গোগা', 'গিলিগিলি' ইত্যাদি।

শব্দ প্রয়োগরীতির ক্ষেত্রেও শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের বিশেষত্ব লক্ষণীয়। 'পোর্ট্রেট' গল্পে সুনীল জানা বলেছেন—

> ' সেই হেতু
> অগত্যা
> অতএব
> এমতাবস্থায়
> লোকটা কী করবে বুঝতে না পেরে আয়নাকে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া রেখে তার সামনে তেমনি চুপচাপ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।''[২৫]

বুঝতে না পারার ভূমিকা রচনা করে পূর্ববর্তী চারটি শব্দ। কিংবা সুব্রত সেনগুপ্তের 'জামা' গল্পে দেখা যায়—''পথে জামার উপকারিতা সম্বন্ধে অমিয় আমাকে অনেক কথা বলতে লাগল। যেমন অমুক, যেমন ইয়ে, যেমন ইত্যাদি ইত্যাদি।''[২৬] দ্বিতীয় বাক্যটির কোন নিজস্ব বক্তব্য নেই, প্রথম বাক্যটির ভাবকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া। অমুক, ইয়ে, ইত্যাদি—এই শব্দগুলি প্রথম বাক্যের 'অনেক' শব্দটির বিস্তার ঘটায় মাত্র।

শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা ভাষারীতির ক্ষেত্রে কোনো ছুঁতমার্গে বিশ্বাসী ছিলেন না। তৎসম শব্দের পাশাপাশি আটপৌরে শব্দকে সাবলীলভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁরা। যেমন—

১. ''গোল্লায় যাক্ মেয়েরা! এই বেশ আছি—ভেবে বিজন দিব্বি চাকরি-বাকরি করে, আড্ডা মেরে, সিনেমা দেখে, বই পড়ে, মাঝে মাঝে কবিতা-টবিতা লেখার চেষ্টা করে দেদার সময় কাটিয়ে দিতে লাগল।''[২৭] (সুনীল জানা 'গল্পের বিজন')

২. ''-ইয়ে মানে একটা 'সিলি' কোশ্চেন করার ছিল আপনাকে-''[২৮] (কল্যাণ সেনের 'যখন সময়')

৩. ''তারপর লাঞ্চে কি খাওয়াল জানিস? মাইরি বিশ্বেস করতে পারবি না''[২৯] (বলরাম বসাক 'কফি হাউস')

৪. ''আসলে কি জানেন খেলে টেলে কিছু হয় না .... খাবি খেতে থাকলে পালস্ ফালস্ ওরকম অনেকেরই খুঁজে পাওয়া যায় না''[৩০] (বলরাম বসাক 'কফি হাউস')

৫. ''শালা, তোর তাতে কি? ....
তুমি ছুরি খেলে, তোমার বাড়ীর লোক কি খাবে চাঁদু?''[৩১] (আশিস ঘোষ 'এখানে')

৬. ''ভ্যাট! এসব কথা কী ঠিক?''[৩২] (কল্যাণ সেন 'ডায়রি')

৭) ''শালা বাচ্চা শুয়োরেরা! আমি এসে গেছি, এবার তোমাদের একদিন, কী আমার; ঘুঘু দেখেছ চাঁদুরা, জিরাফ দেখনি!''[৩৩] (কল্যাণ সেন 'জিরাফ')

সাহিত্যিক ভাষা নয়, সরাসরি মুখের ভাষাকে তুলে ধরেছেন তাঁদের গল্পে। তাঁদের কাছে, ''চুম্বন মানে চুমু / হ্যাঁ নৃত্য মানে নাচ''[৩৪] (বলরাম বসাক 'কফি হাউস')।

অধিকাংশ গল্পের ক্ষেত্রেই দেখা যায় টুকরো টুকরো অসংলগ্ন বাক্য, যা চিন্তাতরঙ্গের রূপদান করে। যেমন—

১. ''অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার।.... সে .... কিনা .... কি যেন .... সে আর .... কোন শূন্যে .... কোথায় .... শূন্যে ভাসছে কি না .... বুঝতে পারল না''[৩৫] (সুব্রত সেনগুপ্ত)

২. ''একটা কালো হাত—। হাত পাঞ্জা। কালো দস্তানা পরা—। হাত পাঞ্জা—হাত পাঞ্জার ছায়া। .... বেশ আলতো করে ছায়াটা ছায়ার মতো—আমার কিছু দেখবার আগে আমার চোখ ঢেকে গেল। .... গালের ওপর ভীষণ—বাড়িটা .... জানালাটা .... সাইনবোর্ডটা .... কাকটা, বাঁশটা .... গাছটা .... রাস্তাটা .... ট্রামলাইনটা নড়তে লাগল। ভীষণভাবে নড়তে লাগল। দুলতে লাগল। দুলতে দুলতে পড়ে যেতাম—আমার কলারে টান লাগছে—যুবকটি—কলারের ফাঁস—ঝুলছি—মাথাটা ঝাকুনি খেল। কানটা ভীষণ গরম লাগছিল—

সে সময় ভীষণ জোরে ডানদিকে—কানের ভিতরে একটা প্রচণ্ড শব্দ। কানে শুনতে পাচ্ছি না। চোখে দেখতে পাচ্ছি না।”[৩৬] (বলরাম বসাক ‘নিষেধ’)

প্রথম উদাহরণে বুঝতে না পারাটিকে তথ্যাকারে উল্লেখ না করে সুব্রত সেনগুপ্ত শব্দচয়নে, শব্দসজ্জায়, বাক্যবন্ধে সেই বুঝতে না পারার অনুভূতিটিকে প্রবাহিত করে দিয়েছেন। আবার বলরাম বসাক ‘নিষেধ’ গল্পে উত্তম পুরুষ কথকের প্রহৃত হওয়ার ঘটনাটিকে তথ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি, এমনকি ঘটনাটি প্রচলিত রীতিতে ঘটিয়েও দেখাননি—ভাষা দিয়ে শব্দ দিয়ে সেই অনুভূতিটিকে নির্মাণ করে গেছেন।

কেবল অনুভূতিকে নয়, তাঁর ভাষার মধ্য দিয়ে, সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রকে, পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন—

১. “এই যে এদিকে—
বলুন
কি আছে?
চা কফি টোস্ট
আর
ভেজিটেবল চপ মিট ডেভিল
আর
আর—
অন্যকিছু?
কি চাই, বলুন না
একটা চা
আর কিছু
শুধু চা”[৩৭] (আশিস ঘোষের ‘রাস্তা’)

২. “খেলে হয় একটা কিছু
কফি
নো, থ্যাঙ্কস, কফি খেলে রাত্রে
অবশ্য কফি ছাড়া .... তা না হলে .... চা .... মানে .... চালের দর .... চালের দর এবার অনেকটা .... না চালের .... কোন চালাকি চলবে না, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না,”[৩৮] (বলরাম বসাক ‘কফি হাউস’)

প্রথম উদাহরণে আশিস ঘোষের ‘রাস্তা’ গল্পে দেখা যায়, যিনি কেবলমাত্র এক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই নেবেন না, তিনি খাবারের সম্পূর্ণ ফর্দ জিজ্ঞাসা করেন। দ্বিতীয় উদাহরণে কফির প্রসঙ্গে চা, চা থেকে চাল, চাল থেকে চালাকি—লেখক এভাবে ভাষামাধ্যমে মাতালের ভাবনার অসংলগ্নতাকে তুলে ধরেছেন।

শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের লেখায় সমান্তরাল গঠনের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন—

১. ‘ যদি, একবার এই দেওয়ালটা পেরুতে পারি!
যদি, একবার ও-পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি!!
যদি, একবার বাইরে যেতে পারি!!!”[৩৯] (আশিস ঘোষের ‘যদি’)

২. ‘ সেই ট্রাম
সেই বাস
সেই ট্যাকসী

সেই অফিস
সেই দোকান
সেই ফুটপাথ
সেই রাস্তা
ছুটতে ছুটতে ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁপাতে হাঁপাতে''[৪০] (আশিস ঘোষ 'কলকাতা ৭২')

প্রথম উদাহরণে সমান্তরাল গঠনের মাধ্যমে বদ্ধতা থেকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় উদাহরণে জীবনের একঘেয়েমিকে তুলে ধরা হয়েছে।

এঁদের গল্পে বিবিধ চিহ্নের প্রয়োগও লক্ষণীয়—

১. ''তারপর সকাল .... বাজার .... ট্রাম-বাস .... অফিস .... দুজন দুজনকে চিনে চিনে চিনে .... ভুলে ভুলে ভুলে .... চিনে চিনে .... ভুলে ভুলে চল্লিশ .... পঞ্চাশ .... যা .... ট ....''[৪১] (সমর মিত্র 'দুইজন')

২. ''আসুন আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ইনি বলরবম বলব সক .... সক .... স .... ক .... ক''[৪২] (বলরাম বসাক 'কফি হাউস')

৩. ''পাচ্ছ?
!
পাচ্ছ না?
কই আমিতো ....

?
!
পাচ্ছ না?
কই আমিতো ....

?
!
?
!''[৪৩] (রমানাথ রায় '! !')

প্রথম উদাহরণে দু'জনের জীবনযাপনের ধারাকে তুলে ধরতে গিয়ে, জীবনের প্রতিটি সংলগ্ন উপাদানকে '....' চিহ্নের প্রয়োগে বোঝানো হয়েছে। এই পুরো গল্পটিই '....' চিহ্নবহুল। আবার দ্বিতীয় উদাহরণে মাতালের বয়ানে 'বলরাম বসাক' কীভাবে উচ্চারিত হতে পারে তার দৃষ্টিগ্রাহ্য একটি রূপ দিয়েছেন লেখক, এলোমেলো বর্ণ-বিন্যাস এবং '....' চিহ্নের প্রয়োগে। তৃতীয় উদাহরণটি রমানাথ রায়ের '! !' গল্প থেকে। লক্ষণীয়, গল্পের নামটিই চিহ্নের প্রয়োগে। উদাহরণটিতে একই কথোপকথনের তিনবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু লেখক সেই একই কথার পুনরুক্তি ঘটাননি। কথাগুলোকে বাদ দিয়ে, কেবল এক্সপ্রেশনগুলিকে ধরেছেন চিহ্নের মাধ্যমে।

চিহ্নের বহুল ও বিবিধ প্রয়োগ থাকলেও, তাঁরা কখনো কখনো যতিচিহ্নে অনাগ্রহী। রমানাথ রায়ের 'বলার আছে' পুরো গল্পটিতে একটিও যতিচিহ্ন নেই। একটানা বলে যাওয়া। আশিস ঘোষের 'কলকাতা ৭২' গল্পেও যতিচিহ্নের ব্যবহার নেই। আশিস ঘোষের 'রাস্তা' গল্পে বাক্যের শেষে দাঁড়ি থাকলেও প্যারার শেষে দাঁড়ি নেই।

এঁদের গল্পে স্পেসের ব্যবহারও আমাদেরকে অবাক করে। যেমন—

১. ''এবার একটু এগোলাম এক ইঞ্চি
তারপর আবার এগোলাম এক ইঞ্চি
তারপর আবার এক ইঞ্চি''[৪৪] (রমানাথ রায় 'গাড়ি')

২. ''একটা মাতাল
এ
এ কা কী এ কা
কী
হাঁটছে''[৪৫] (আশিস ঘোষ 'কলকাতা ৭২')

৩. '' ভে বে ছি লা ম
বে
ছি
লা
ম''[৪৬] (রমানাথ রায় 'ইচ্ছে ছিল')

প্রথম উদাহরণে কথক অনেক কষ্টে এক ইঞ্চি করে এগোয়—''গাড়িটা এখন আমার কাছে। আর এক হাত। তবু অনেক। আমার কাছে অনেক।''[৪৭] কথকের কাছে এক ইঞ্চি দূরত্বটাও যে অনেক, তা পাঠকের কাছে দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনাসহ ফুটিয়ে তোলার জন্যই 'এক ইঞ্চি' শব্দটির আগে অনেকটা স্পেস দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে একাকিত্বের চতুষ্কোটি বিস্তার। তৃতীয় উদাহরণেও ভাবনার দ্বিমুখী বিস্তার, উল্লম্ব এবং সরলরৈখিক। কখনও আবার যতি চিহ্নের পরিবর্তে স্পেসের ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন মদনমোহন বিশ্বাসের 'তিল' গল্প। সুনীল জানার 'কম্পোজিশন-১' গল্পে এক একটি বাক্যের পর সাদা জায়গা ফাঁকা রেখে পরের বাক্য শুরু করতে দেখাটা আমাদের অভ্যাসের বাইরে। আবার কখনও শব্দের মাঝে স্পেসের বিলুপ্তি ঘটিয়ে কিছু বোঝানো হয়েছে, যেমন—

> ''ঠিক ন'টার সময় আবার সাইরেন সবাই ছুটছে ট্রামে বাসে উঠছে নামছে হাঁটছে হাঁপাচ্ছে অফিসদোকানহোটেলরেস্তোরাঁট্রামবাসট্রেনলরীটেম্পোট্যাকসীতে লোক লোক লোক লোকলোকলোক''[৪৮] (আশিস ঘোষ 'কলকাতা ৭২')

সকাল ন'টার সময়ে রাস্তার চলমান ভিড়ের অবিচ্ছিন্নতা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ পেয়েছে এখানে।

সমান্তরাল গঠন, ত্রিবিন্দু ও স্পেসের বহুল ব্যবহার, কখনও পুরো গল্পে একটিও যতিচিহ্ন ব্যবহার না করা, ছোট ছোট বাক্য—এমন কী একটি বা দুটি শব্দের বাক্য, আবার কখনও পুরো একটি অনুচ্ছেদের সমান অতিবৃহৎ বাক্য, কখনও একটি মাত্র অনুচ্ছেদই গল্প, কখনও একটি বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে পরবর্তী বাক্যে চলে যাওয়া—ভাষাশৈলীর এই অভিনবত্বে শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলি প্রচলিত ঘরানার ছোটগল্প থেকে আলাদা হয়ে যায়।

৪

> ''বলার কথা তো অনেকের আছে, তাঁরা কি লেখক? না, বলতে জানা চাই। কেমন করে বলব সেটাই জরুরী। মাধ্যমটার জন্যেই তো সাধনা। বলার কথা জোগায় জীবন, জীবনের অভিজ্ঞতা আর অনুভব, কিন্তু বলার মতো বলতে পারা চাই। নইলে রবিশংকর অবনীন্দ্রনাথই বা কে আর আমিই বা কে? নইলে নীরব কবিও কবি।''[৪৯]

ঊনবিংশ সংকলনের শেষে গ্রন্থ-আলোচনা অংশে অতীন্দ্রিয় পাঠকের 'অন্তর্মুখ/পরিক্রমা' গল্প সংকলনের আলোচনা প্রসঙ্গে পরেশ মণ্ডল বলেছেন একথা।

শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা আদি-মধ্য-অন্ত্য সম্বলিত কোনো কাহিনি বা প্লটে বিশ্বাসী ছিলেন না। যে কারণে তাঁদের গল্প অধিকাংশ সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয়ে ওঠেনি। তাঁদের প্রধান ও প্রথম আপত্তি ছিল প্লট বা কাহিনি নির্মাণের বিরুদ্ধে। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে জীবন কাহিনির মতো কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত ঘটনাসমষ্টি নয়, জীবন অনেক বেশি এলোমেলো এবং যুক্তিবিরোধী। 'এই দশক' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় রমানাথ রায় 'শাস্ত্রবিরোধিতা কেন এবং প্রকৃত বাস্তবতা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন—

> আমার প্রধান ও প্রথম আপত্তি প্লট বা কাহিনী নির্মাণের বিরুদ্ধে। জীবন কাহিনীর মত কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত ঘটনাসমষ্টি নয়। জীবন কি অনেক বেশী একঘেয়ে এলোমেলো এবং যুক্তিবিরোধী নয়।[৫০]

প্লট বা কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ ঘটনাবলী এই গল্পগুলিতে নেই ঠিকই, তবে তার বদলে এক স্মৃতিসূত্র গল্পগুলিকে বেঁধে রাখে। সুনীল জানার 'বৃষ্টি' গল্পে কথক বলেছেন—

> এখন বর্ষাকাল। বর্ষার মেঘ দেখে ময়ূর নাচে শুনেছি। আমি কোনদিন ময়ূর দেখিনি। তবে বর্ষার কবিতায় ময়ূর নাচের কথা পড়েছি। ময়ূরের বিষয় নিয়ে আমি একবার বিপদে পড়েছিলাম।[৫১]

এক স্মৃতির সূত্র ধরে চলে যাচ্ছেন আরেক স্মৃতিতে। বলরাম বসাক 'নিষেধ' গল্পে উত্তর পুরুষ কথক বলেছেন—

> ''মা আমার জন্মের পর থেকে আমাকে অনেক বিষয়ে বারণ করেছে। .... বদছেলের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিল কারণ বদছেলের সঙ্গে মিশলে আমার বদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ চন্দন গাছের সঙ্গে অন্য গাছ জন্মালে সেই গাছের গন্ধও চন্দন গাছের
> আমার কোন এক বন্ধু ছিল নাম যার চন্দন। .... ''[৫২] (বলরাম বসাক 'নিষেধ')

স্মৃতির সূত্র ধরে বাক্য অসম্পূর্ণ রেখেই পরবর্তী অনুচ্ছেদে চলে গেছেন লেখক। অধিকাংশ শাস্ত্রবিরোধী গল্পেই বাস্তব ঘটনার বা ঘটনাবলীর কার্যকারণ সূত্রের বদলে এক স্মৃতিসূত্র গল্পকে বেঁধে রাখে। এই গল্পগুলিতে ঘটনার আকর্ষণ খুবই কম।

যেহেতু এই গল্পগুলির বিষয় অন্তর্জগৎ এবং চরিত্রের অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রধানত একটি মুড ধরা পড়ে, তাই গীতিকবিতার সঙ্গে এই ধরণের গল্পের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কখনো কোন বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতিই গল্পের রূপ পায়। ফলত গল্পের আদি-মধ্য-অন্ত্য বলে কিছুই থাকে না। এখানে কাহিনির গতি খুব মন্থর। একটিমাত্র অনুভূতি বা আবহ ফুটিয়ে তোলা গল্পকারদের লক্ষ্য। 'গল্প আঠারো' গ্রন্থের 'পরিচিন্তন' শীর্ষক ভূমিকা অংশে অলোক রায় লিখেছেন—''আধুনিক ছোটগল্প ক্রমশ ঘটনা থেকে চরিত্রে, চরিত্র থেকে আবহে, আবহ থেকে অনির্দেশ্য চেতনাপ্রবাহের জগতে নিত্য রূপান্তর লাভ করেছে।''[৫৩]

যেহেতু আদি-মধ্য-অন্ত্য নেই, তাই এই জাতীয় গল্পে ক্লাইম্যাক্স নির্দেশ খুব কঠিন। গল্পগুলো কখনো কখনো এপিসোডিক। জীবনের একঘেয়েমিকে তাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পের গঠনের মধ্য দিয়েও। যেমন—সুনীল জানার 'সাক্ষাৎকার ২' গল্পের পাঁচটি অনুচ্ছেদ। প্রথম চারটি অনুচ্ছেদে একই ঘটনা পুনরাবৃত্তি, কেবল 'setting'-টা বদলে যায়। আর পঞ্চম অনুচ্ছেদটি এই চারটি 'setting'-কেই ছুঁয়ে রয়েছে। আবার অমল চন্দের 'বারান্দা' গল্পটি চারটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত, প্রতিটি অনুচ্ছেদই আসলে এক একটি অতিবৃহৎ বাক্য। প্রথম বাক্য বা অনুচ্ছেদে একজন লোকের কিংবা বলা যায় আমার, আপনার বা যে কোনো কারোর জীবনের বাল্য ও কৈশোরের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্য তথা অনুচ্ছেদে যথাক্রমে কৈশোর-যৌবন, যৌবন-প্রৌঢ় ও বার্ধক্যের কথা বলা হয়েছে। জীবনের এই প্রতিটি পর্যায় একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ; 'সে ঘরের সঙ্গে বারান্দা আছে' এবং প্রতিটি অনুচ্ছেদের শেষেই লোকটি ভাবে—''বারান্দা, আমার বারান্দা, আমি একদিন বারান্দায় চলে যাবো!''[৫৪] সুব্রত সেনগুপ্তের 'বিস্কুট' গল্পে সুব্রত আর আরতি একটি গোপন অভিসারে প্রয়াসী। গোপন প্রেমের অপরাধবোধ আর ভয় থেকেই যেন পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে একই দৃশ্যের। দেবেশ রায় 'শাস্ত্রবিরোধিত' ও গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—

> ‘শাস্ত্রবিরোধী গল্প’-এ কোনও গল্প শুরুই হয় না, সুতরাং গল্পের কোনও চলনই নেই। সুতরাং গল্পের কোনও শেষই নেই। একটা কোনও আবর্তন ঘটছে আর সেই আবর্তনের প্রয়োজনে একটা কোনও চলন শুরু হয়ে গেছে—মোবাইলে ভুল একটা সংকেত টেপার মতো অর্থহীন চলন। কিন্তু সেই অর্থহীনতার ভিতর পাঠক তাঁর গল্প-পড়ার অভ্যেস অনুযায়ী কিছু একটা অর্থ পেতেও পারেন। না পেতেও পারেন—কিন্তু সেটা পাঠক বোঝার আগেই গল্পটা শেষ হয়ে যায়।[৫৫]

৫

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বদলায়। সেই তাগিদেই বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক একটি সাহিত্য আন্দোলন এসেছে, এক একটি বাঁকবদল এসেছে। যে তাগিদে এই সাহিত্য আন্দোলনগুলির সূত্রপাত ঘটেছিল, আবার সেই তাগিদেই এগুলির অবসানও ঘটেছে। প্রসঙ্গত অলোক রায়ের একটি বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—“গল্পকারেরা এর মধ্যে নতুন পথের সন্ধান করবেন, এটাই স্বাভাবিক।.... এই সময়ে একদা নতুন রীতির গল্প পুরোনো রীতিতে পরিণত হয়।”[৫৬] ঠিক এভাবেই ‘শাস্ত্রবিরোধিতা’ও যখন শাস্ত্রে বা নিয়মে পরিণত হয়ে ওঠে, তখন সেই শাস্ত্র বা নিয়মকেও ভাঙার দরকার হয়। ‘পঞ্চাশৎ পরিক্রমা’ গ্রন্থের ‘ছোটগল্প ১’ শীর্ষক নিবন্ধে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন—“এই শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন মূলতই আত্মকেন্দ্রিক, ব্যক্তির অস্তিত্বকেন্দ্রিক। এঁদের অনেক গল্পে একটি সামাজিক ঘেরাটোপ থাকত; কিন্তু ঝোঁকটা ছিল ‘ব্যক্তি’র ওপরেই।.... ‘অতিরিক্ত’ আত্মকেন্দ্রিক বলেই পাঠক সমাজে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি।”[৫৭] এই বক্তব্যকে আরেকটু টেনে বলা যায়, শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলির বিষয় অন্তর্বাস্তবতা হওয়ায় এবং সাধারণ পাঠককুল আদি-মধ্য-অন্ত্য নির্দেশিত প্লটযুক্ত আদ্যন্ত ঘটনাপ্রধান নিটোল গল্পপাঠে অভ্যস্ত হওয়ায়, এই গল্পগুলি সাধারণ পাঠকসমাজে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। ফলত, এই লেখকদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে “বড় পত্রিকার বাণিজ্য জগতের গহ্বরে ঢোকার আহ্বানে সাড়া দেন”[৫৮] বা দিতে বাধ্য হন, তবে তা কখনই তাঁদের অভিপ্রেত ছিল না। রমানাথ রায় বলেছেন—“বাজারের কথা ভেবে অর্থাৎ পাঠকদের মুখের দিকে তাকিয়ে যাঁরা গল্প উপন্যাস লেখেন তাঁরা প্রকৃত লেখক নন। প্রকৃত লেখক অন্তরের তাগিদ থেকে লেখেন।.... আমরা জনতার রুচি অনুযায়ী লিখতে চাইনি। আমরা আমাদের রুচি অনুযায়ী লিখতে চেয়েছি। এতে পাঠকেরা যদি সাড়া দেয়, তাহলে তা খুবই আনন্দের। কিন্তু সাড়া না দিলে আমাদের কিছু করার ছিল না।”[৫৯] দায় সাধারণ পাঠকের। ঊনবিংশ সংকলনের শেষে গ্রন্থ-আলোচনা অংশে অতীন্দ্রিয় পাঠকের ‘অন্তর্মুখ/পরিক্রমা’ গল্পসংকলনের আলোচনা প্রসঙ্গে পরেশ মণ্ডল বলেছেন, “লেখকের কাজ কি পাঠকের পেছনে ছুটে মরা? না, পাঠককে তাঁর কাছে টানা? .... পাঠকের অতীত অভ্যাসকে মেনে নিয়ে নয়, নতুন অভ্যাসের সঞ্চার করে।”[৬০]

আজকের বাংলা ছোটগল্প শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন পার হয়ে অনিবার্য বিবর্তনের পথে চলেছে। এই আন্দোলন পাঠকের পুরোনো পাঠাভ্যাসে জোর ঘা দিয়ে পারম্পর্যময় বাঁধা ফ্রেমের গল্পের বাইরেও যে অন্যতর কিছু আছে সে বিষয়ে তাকে সজাগ করেছে। ‘শাস্ত্রবিরোধিতা ও গল্প’ শীর্ষক প্রবন্ধে দেবেশ রায় স্মৃতিচারণা করে বলেছেন—

> ১৯৬৬-তেই জলপাইগুড়িতে পাতলা ছোট একটি কাগজ ডাকে এসেছিল। ‘এই দশক’। যদ্দূর মনে পড়ে, পাতা উলটে একটি গল্প পড়ে আবার গোড়া থেকে পড়তে শুরু করি। যদ্দূর মনে পড়ে, গল্পটি ছিল রমানাথ রায়-এর ‘বলার আছে’। ১৯৬৬-তে ওই গল্প পড়ে চমকে গেলাম আর বাংলা গল্পের বাঁধ তাহলে আরও ভাঙা গেছে ভেবে ফূর্তি পেলাম।[৬১]

কথক ঠাকুরের মত টানা গল্প বলার ধরনটি শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন, আজকের গল্পকাররা অনেকেই আর বিবৃতিপন্থী নন। যে কোনও সাহিত্য পত্রিকা নিলেই দেখা যাবে, শুরু-মধ্য-শেষের শাস্ত্রীয় ছকে বাঁধা নিটোল গল্পের চেহারাটা বদলে গেছে। আজকের গল্পে আখ্যানের বুননের মধ্যেই ঢুকে পড়ে কল্পজগৎ, মগ্ন চৈতন্যের স্মৃতিপুঞ্জ। ‘শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার কল্যাণ সেন’ শীর্ষক প্রবন্ধে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন—

> এই ধারাতেই এসেছেন সুভাষ ঘোষাল, মধুময় পাল, কিছুটা প্রবীণ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রবিশংকর বল, দেবর্ষি সারগী, সমীরণ দাস। এ কথা বলতে চাইছি না যে, শেষোক্ত লেখকেরা শাস্ত্রবিরোধী গল্পধারার অনুগামী। বলতে চাইছি—আখ্যান নির্ভর, পরিণামমুখী, নরনারী-সম্পর্কের বাইরে এসে, বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর ভালো লাগার প্রত্যাশা মেটাবার চেষ্টা না করে মনোগহনের উদঘাটনই এই লেখকদের অভিপ্রায়।[৬২]

সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংকলিত ও সম্পাদিত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' গ্রন্থে স্বপ্নময় চক্রবর্তী সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে তিনি ও তাঁর সমকালের লেখকেরা এই আন্দোলনগুলির দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন—

> স্বীকার করি বা না করি প্রভাব একটা থাকে এবং আছেও। .... সুব্রত সেনগুপ্ত-অমল চন্দ-আশিস ঘোষ-বলরাম বসাক-শেখর বসু-সুনীল জানা এবং অবশ্যই রমানাথ রায়—ছয়ের দশকে নতুন ভাবে গল্প বলার সাহস দেখিয়েছিলেন বলে সত্তরের গল্পে একটা পরিবর্তন এসেছিল। শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলি সামনে না থাকলে পরবর্তী সময়ের গল্পগুলি ঘটনাকেন্দ্রিক হয়েও একটু অন্যরকম হয়ে উঠতে পারত না বোধ হয়। সাতের দশক থেকে বাংলা গল্পে একধরনের ডক্যুমেন্টেশন ঢুকল, হিপোক্রাট ঢুকল, শুধু একটা সলিলকিতে গল্প বলা হল। এই ধরনের যে এক্সপেরিমেন্টগুলো করলেন লেখকরা, তার পিছনে শাস্ত্রবিরোধীদের অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।[৬৩]

আবার অমর মিত্র স্পষ্টতই জানিয়েছেন যে, তিনি ফর্ম সচেতন হয়েছেন শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের প্রভাবে। শাস্ত্রবিরোধীরা পরবর্তী গল্পকারদের কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন সে প্রসঙ্গে অমর মিত্র সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> গল্পের বিষয়ে নয়, আঙ্গিকে অবশ্যই হাংরি-শাস্ত্রবিরোধীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আমাদের কালে গল্পের ফর্ম সম্পর্কে যে সচেতনতা তৈরি হয়েছে সেটা শাস্ত্রবিরোধীদের প্রভাব তো বটেই। গল্পে নতুন নতুন ফর্ম ব্যবহার করার সাহস আমি পেয়েছি মূলত ওঁদের কাছ থেকেই।[৬৪]

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন এই ভাবে তার অস্ত্যর্থক ভূমিকা পালন করেছে। প্রসারিত করে দিয়েছে ছোটগল্পের সংজ্ঞা। শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে গল্পের চর্চাকে অনেক ব্যাপক, গভীর ও নতুন তাৎপর্যমুখী করে তুলেছে—এ-কথা অস্বীকারের উপায় নেই।

তথ্যসূত্র

১. উত্তম দাস, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা-৭৪৩৩০২ : মহাদিগন্ত, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৯৮-১০১।

২. তদেব, পৃ. ১০১।

৩. তদেব, পৃ. ১০১।

৫. ''কয়েকটি তথ্য'', 'এই দশক' পত্রিকা, অষ্টম সংকলন, কলকাতা-৩৮, পৌষ ১৩৭৫, পৃ. ৪৩-৪৪।

৫. শেখর বসু সম্পাদিত, শাস্ত্রবিরোধী গল্প, কলকাতা-৭৩, এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৪।

৬. অতীন্দ্রিয় পাঠক, ''অমল চন্দকে যেভাবে জেনেছি'' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, কলকাতা-৭০০১১১ : গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৪১০।

৭. উত্তম দাস, পূর্বোক্ত হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃ. ৯৭।

৮. Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn, UK ; Charles L. Webster and Company, 1884, P. 1.

৯. রমানাথ রায়, ''শাস্ত্রবিরোধীতা : ছোটগল্প ও শাস্ত্রবিরোধীতা'' প্রবন্ধ, ধনঞ্জয় ঘোষাল, প্রগতি মাইতি ও দেবাশিস মজুমদার সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্যে আন্দোলন, কলকাতা-১১৮ : ইসক্রা, জুন ২০১৪, পৃ. ১৭।

১০. রমানাথ রায়, সম্পাদকীয় নিবন্ধ, 'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য', দ্বিতীয় সংকলন, কলকাতা-৩৮, মাঘ ১৩৮১।

১১. শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬।

১২. এই দশক, ষষ্ঠ সংকলন, কলকাতা-৩৮, বৈশাখ ১৩৭৫, পৃ. ৩।

১৩. রমানাথ রায়, ''শাস্ত্রবিরোধীতা : ছোটগল্প ও শাস্ত্রবিরোধীতা'' প্রবন্ধ, ধনঞ্জয় ঘোষাল, প্রগতি মাইতি ও দেবাশিস মজুমদার (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যে আন্দোলন, কলকাতা-১১৮ :ইসক্রা, জুন ২০১৪, পৃ. ১৪।

১৩. শেখর বসু সম্পাদিত, শাস্ত্রবিরোধী গল্প, কলকাতা-৭৩, এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৪২।

১৫. তদেব, পৃ. ৪২-৪৩।

১৬. উত্তম দাস, পূর্বোক্ত হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃ. ৫২।

১৭. শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৭।

১৮. তদেব, পৃ. ৬৫।

১৯. তদেব, পৃ. ৬৫-৬৬।

২০. সুমিতা চক্রবর্তী, "শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার কল্যাণ সেন" প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, কলকাতা-৭০০১১১ ; গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৪০৪।

২১. অতীন্দ্রিয় পাঠক, ''অমল চন্দকে যেভাবে জেনেছি'' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃ. ৪১০।

২২. শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭৮।

২৩. সমরেশ মজুমদার, ''ছোটগল্প ২'' প্রবন্ধ, পঞ্চাশৎ পরিক্রমা, শান্তিনিকেতন : গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, বিশ্বভারতী, ২২ শ্রাবণ ১৪০০, পৃ. ৯৬।

২৪. উত্তম দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৩।

২৫. শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩১-১৩২।

২৬. তদেব, পৃ. ৫৬।

২৭. অলোক রায় সম্পাদিত, গল্প আঠারো, কলকাতা-৭৩, মডেল পাবলিশিং হাউস, পৃ. ১৯।

২৮. শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৬।

২৯. এই দশক, ত্রয়োদশ সংকলন, কলকাতা-১১, কার্তিক ১৩৭৭, পৃ. ১।

৩০. তদেব, পৃ. ৫।

৩১. এই দশক, চতুর্দশ সংকলন, ১৩৭৮, পৃ. ১১।

৩২. তদেব, পৃ. ৩৪।

৩৩. এই দশক, অষ্টাদশ সংকলন, কলকাতা-১১, মাঘ ১৩৮০, পৃ. ২৯।

৩৪. এই দশক, পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ সংকলন, পৃ. ৬।

৩৫. শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৩।

৩৬. তদেব, পৃ. ১১৩।

৩৭. এই দশক, সপ্তম সংকলন, কলকাতা-৩৮, শ্রাবণ ১৩৭৫, পৃ. ১-২।

৩৮. এই দশক, পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ সংকলন, পৃ. ১।

৩৯. শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮৫।

৪০. এই দশক, ষোড়শ সংকলন, কলকাতা-১১, বৈশাখ ১৩৭৯, পৃ. ১৫।

৪১. এই দশক, পূর্বোক্ত অষ্টম সংকলন, পৃ. ৪২।

৪২. এই দশক, পূর্বোক্ত ত্রয়োদশ সংকলন, পৃ. ১।
৪৩. এই দশক, পূর্বোক্ত অষ্টম সংকলন, পৃ. ৩৯-৪০।
৪৪. এই দশক, পূর্বোক্ত সপ্তম সংকলন, পৃ. ১০।
৪৫. এই দশক, পূর্বোক্ত ষোড়শ সংকলন, পৃ. ১৪।
৪৬. এই দশক, দ্বাদশ সংকলন, কলকাতা-১১, আষাঢ় ১৩৭৭, পৃ. ৯।
৪৭. এই দশক, পূর্বোক্ত সপ্তম সংকলন, পৃ. ১২।
৪৮. এই দশক, পূর্বোক্ত ষোড়শ সংকলন, পৃ. ১২।
৪৯. এই দশক, ঊনবিংশ সংকলন, কলকাতা-৬, ১৩৮১, পৃ. ৩৫।
৫০. উত্তম দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৪।
৫১. শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৫।
৫২. শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১৪।
৫৩. অলোক রায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ভূমিকা অংশ।
৫৪. শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৩-১০৪।
৫৫. দেবেশ রায়, 'শাস্ত্রবিরোধিতা ও গল্প', সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃ. ৩৪৫।
৫৬. অলোক রায় সম্পাদিত, গল্প আঠারো, কলকাতা-৭৩; মডেল পাবলিশিং হাউস, ভূমিকা অংশ।
৫৭. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'ছোটগল্প ১' প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'পঞ্চাশৎ পরিক্রমা' গ্রন্থ, পৃ. ৮৪-৮৫।
৫৮. অরূপকুমার দাস, ষাট ও সত্তরের দশকে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর ২০১২, পৃ. ১৪।
৫৯. রমানাথ রায়, 'শাস্ত্রবিরোধীতা : ছোটগল্প ও শাস্ত্রবিরোধীতা', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯।
৬০. এই দশক, পূর্বোক্ত ঊনবিংশ সংকলন, পৃ. ৩৫।
৬১. দেবেশ রায়, 'শাস্ত্রবিরোধিতা ও গল্প', সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃ. ৩৩৮।
৬২. সুমিতা চক্রবর্তী, 'শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার কল্যাণ সেন' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃ. ৩৯৯-৪০০।
৬৩. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, কলকাতা-৭০০১১১, গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৪৩৬-৪৩৭।
৬৪. তদেব, পৃ. ৪৩৯।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অতীন্দ্রিয় পাঠক, নির্বাচিত প্রবন্ধ, কলকাতা : একুশ শতক, ডিসেম্বর ২০১৩।
২. অনিল আচার্য সম্পাদিত, সত্তর দশক, কলকাতা-৯, অনুষ্টুপ, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৪।
৩. অপূর্ব কুমার রায়, শৈলীবিজ্ঞান, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৬।
৪. অভিজিৎ মজুমদার, শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬।
৫. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, জোয়ার ভাঁটায় ষাট সত্তর, কলকাতা, পার্ল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭।

৬. অরূপকুমার দাস, ষাট ও সত্তরের দশকে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর ২০১২।
৭. অলোক রায় সম্পাদিত, গল্প আঠারো, কলকাতা-৭৩, মডেল পাবলিশিং হাউস।
৮. অলোক রায়, বিশ শতক, কলকাতা-৭৩, প্রমা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১০।
৯. উত্তম দাস, গল্প ষাট-সত্তর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মহাদিগন্ত, ১৯৮৭।
১০. উত্তম দাস, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা-৭৪৩৩০২, মহাদিগন্ত, জানুয়ারি ২০০২।
১১. উদয়কুমার চক্রবর্তী, বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১২।
১২. ধনঞ্জয় ঘোষাল, প্রগতি মাইতি ও দেবাশিস মজুমদার সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্যে আন্দোলন, কলকাতা-১১৮, ইসক্রা, জুন ২০১৪।
১৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, কলকাতা-৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২৫।
১৪. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বিচার তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮।
১৫. শেখর বসু সম্পাদিত, শাস্ত্রবিরোধী গল্প, কলকাতা-৭৩, এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০১০।
১৬. সত্য গুহ, একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল, কলকাতা-১২, অধুনা, ১৯৭০।
১৭. সন্দীপ দত্ত, বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক, কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩।
১৮. সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, কলকাতা - ০৯, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১৬।
১৯. সোহারাব হোসেন, বাংলা ছোটগল্প : তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি, কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ২০১০।
২০. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা গল্প-আন্দোলন, কলকাতা : গাঙচিল, ২০১৯।
২১. সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, কলকাতা - ৭০০১১১ : গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৮।

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

1. Donald Freeman, *Linguistics & Literary Style*, New York : Holt, Rinehart and Winston, 1970.
2. J.V. Cunningham, *The Problem of Style*, New York : Fawcett World Library, 1966.
3. Mark Currie, *Postmodern Narrative Theory*, New York : Macmillan Press Ltd. 1988.
4. Mark Twain, *Adventures of Huckleberry Finn*, U.K. : Charles L. Webster and Company, 1884.
5. Ronald Barthes, *An Introduction to the Structural Analysis of Narratives*, U.K. : University of Birmingham, 1966.
6. Seymur Chatman, *Literary Style : A Symposium*, U.K. : Oxford University Press, 1971.

শিউলি বসাক
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথ ও সূফীতত্ত্ব

তনুকা চৌধুরী

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্ন ও বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে এক যুগান্তকারী প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে—যাঁর ঔজ্জ্বল্যের ছটায় সমকাল শুধু নয়, বাংলা তথা ভারতবর্ষ কেবল নয়—সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হয়ে ওঠে। এই বিশ্ববরণ্যে ব্যক্তিত্ব হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১ খ্রিঃ–১৯৬১ খ্রিঃ)। সাহিত্যের এমন কোনও শাখা নেই যা তাঁর অমর প্রতিভার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। পারিবারিক শিক্ষা ও ঐতিহ্য এবং গভীর অনুসন্ধিৎসা তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে বারংবার। স্বদেশের পুরাতন ঐতিহ্য এবং বিশ্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে নিগূঢ় যোগসূত্র তাঁর মনন উন্মেষ, গঠন ও বিকাশের অন্যতম সহায়ক। অপরাপর বিভিন্ন বিষয়ের ন্যায়, সূফীবাদ, সূফীতত্ত্ব ও আদর্শের প্রতি তিনি আগ্রহ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন এবং সূফীতত্ত্বের মূল আদর্শ নীতি তাঁর বিশাল সাহিত্যকীর্তির মধ্যে প্রস্ফূটিত হয়েছে নব-নব রূপে, নব-আঙ্গিকে। বিশদ আলোচনায় ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে একটু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ ও সূফীবাদের যোগসূত্রের উৎস কোথায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সূফী তত্ত্বের চর্চা ছিল—এই তথ্য ব্রতীশ ঘোষ তাঁর 'সূফী ধর্মের আলোকে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধারে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অধিপতি, অপরদিকে সূফী কবি হাফিজের ভক্ত। দেবেন্দ্রনাথ রচিত 'স্বরচিত আত্মচরিতে' মহান কবি হাফিজের অনেক বয়াৎ-এর উল্লেখ রয়েছে। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যেমন অনেক লিখেছেন, তেমনই পাঠও করেছেন প্রচুর। বেদ-বেদান্ত, সূফী সাহিত্য, বিশ্বের নানা সাহিত্য-দর্শন রবীন্দ্রনাথের মানসলোক গঠন করে। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টি কোনও শাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত নয়, তাঁর সৃষ্টির উৎস নিজস্ব উপলব্ধি ও কল্পনা—যা একান্তই মৌলিক। ব্রতীশ ঘোষের মতে—

> বৈদান্তিক, সূফী ভাবধারা, যাই হোক না কেন, তার সঙ্গে কবির অন্তরের যোগ ছিল, কিন্তু তা অনুকরণ, অনুসরণ, প্রভাবজাত নয়। সূফীবাদ একটি তাত্ত্বিক মতবাদ যা মানুষের অনুধাবনযোগ্য। মূলত ধর্মীয় শাস্ত্র। পারস্যের মহান কবি সাদি-জাস-রুমি প্রমুখ কবিদের মসনবী-গজল-ত্বসিদ প্রভৃতি ফারসি সাহিত্যের অমূল্য ও অসাধারণ কবিতা। কিন্তু তা মূলত সূফীবাদের ব্যাখ্যা এবং মানুষের আচরণীয় ধর্মজীবনের শাস্ত্র যা পালন করে মানুষ প্রেমাস্পদের প্রেম লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের রচনা ধর্মশাস্ত্র নয়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিস্ময়কর প্রকাশ, মানবপ্রীতি ও মানবধর্মের কাব্য। শাস্ত্র ও কাব্যের মধ্যে সীমারেখা টেনেই আমাদের রবীন্দ্রকাব্যের আনন্দলোকে পৌঁছাতে হবে।[১]

এই আনন্দলোকের অনুসন্ধানেই রবীন্দ্রদর্শন ও সূফী তত্ত্বের যোগসূত্র উপলব্ধি করা যায়।

রবীন্দ্রসাহিত্য এবং রবীন্দ্রজীবন চর্চা নিবিড় বিশ্লেষণে বোধগম্য হয় যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় চেতনা ও জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি হল ঈশ্বর ও মানবের অখণ্ডতাবোধ। রবীন্দ্রনাথ মানুষ বলতে কখনই কোনও ব্যক্তি মানুষকে বোঝান নি, তাঁর ভাবনায় সবসময় বিশ্বমানবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। ভারতীয় দর্শন ও উপনিষদে বলা হয় যে, এই বিশ্ব চরাচর পরম

চৌধুরী, তনুকা : রবীন্দ্রনাথ ও সূফীতত্ত্ব
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 1, June 2020, Page : 18-23, ISSN 2249-4332

করুণাময় ঈশ্বরের সৃষ্টি। প্রকৃতি, প্রাণী জগৎ, জড় জগৎ সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের অবস্থান। কিন্তু মানুষের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। উপনিষদের এই বাণীকে রবীন্দ্রনাথ অন্তরে গ্রহণ করেছেন—

তোমায় কিছু দেব ব'লে চায় যে আমার মন,
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন
যখন তোমার পেলাম দেখা, অন্ধকারে একা একা
ফিরতেছিলে বিজন গভীর বন।....
দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি,
গায়ে তোমার ছড়ায় ধুলাবালি।
অপমানের পথের মাঝে তোমার বীণা নিত্য বাজে
আপন সুরের আপন নিগমন।
ইচ্ছা ছিল বরণমালা পরাই তোমার গলে,
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন।[২]

মানব প্রকৃতির সাথে বিশ্বস্রষ্টাকে একযোগে দেখা সূফীমত। ইসলাম ধর্মের উদার, সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির আদর্শকে কেন্দ্র করে সূফী তত্ত্বের ও সাধন পদ্ধতির উদ্ভব। অর্থাৎ সূফীবাদ ইসলাম ধর্মেরই একটি শাখা। ইসলাম ধর্মে প্রাধান্য দেওয়া হয়, বিশ্বমানবের সাথে আল্লাহের সম্পর্কের অখণ্ডতার ওপরে। সূফী সাধকগণ নিজেদের কর্মময় জীবনকে আল্লাহর সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত করেন। তাঁরা মানুষের সেবার জন্য, মানব কল্যাণের জন্য নিজেদের সর্বস্ব সমর্পণ করেন। মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষাই সূফীতত্ত্বের প্রদান নীতি ও আদর্শ। মানবধর্মই রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম—

Tagores God is not thus as cosmic God ... He is a human God,
the enbodiment of man's inner nature.[৩]

ইসলামে বলা হয়, জগতের সৃষ্টির সমস্ত কিছু আল্লাহকে বেষ্টন করে রয়েছে। আল্লাহ অনন্ত, অসীম। রবীন্দ্রনাথ সেই অনন্তকে জানতে চেয়েছেন বিশ্বমানবের সাথে মিলিত হয়ে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, পারস্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতীয় জনপদে সূফীতত্ত্ব ও আদর্শের চর্চার সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে, বেদান্ত, উপনিষদ, ভারতীয় যোগসাধনা, বৈষ্ণবদের মরমিয়াবাদ মিলিত হয়ে তৈরী হয় সূফীতত্ত্বের Mysticism। রবীন্দ্রনাথ এই mysticism-এর সাথে একাত্ম বোধ করেছেন—

> মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞান-কর্মে—ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণে মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে। মানুষের যত দুর্গতি আছে সেই আপন মানুষকে হারিয়ে, তাঁকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে।[৪]

সূফী সাধকগণ এই মনের মানুষের অনুসন্ধান করেন, খুঁজে ফেরেন সত্যকে। রবীন্দ্রনাথের চেতনা ও সূফীগণের সাধনা এক পথে মিলিত হয়। শেখ সাদী বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন—

> রবীন্দ্রনাথ আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ সন্ধানী। সুফিদের মতো বিশ্বাস করলেন, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। যিনি কেবল আত্মারূপে অবতীর্ণ হন, তারপরে আবার আপন সত্তায় ফিরে যান। বিষয়টা এরকম, পানি জমাট বেঁধে বরফে রূপ নেয়, আবার বরফ গলে পানি হয়ে যায়। এভাবে ঈশ্বর থেকে মানুষ; আবার মানুষ থেকে ঈশ্বরে আরোহন।[৫]

সূফী ভাবনায় পরম সত্তা দৃশ্যমান জগতে প্রকাশিত হয়েছে বহু ও বিচিত্ররূপে। রবীন্দ্রনাথ পরমসত্তার গতি সাগরের

সাথে তুলনা করেছেন—

ওই মরণের সাগর-পারে চুপেচুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে।
কারা আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছি চারি দিকের বাধায় ঠেকে,
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে
আজ এসেছে ভুবনমোহন স্বপ্নরূপে।। [৬]

ইসলাম ধর্মে বৈরাগ্যের কোনও স্থান নেই। হজরত মহম্মদকে তাঁর পার্ষদগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন সাধনা কি? সংসার ধর্ম, আত্মীয়, পরিজন, সমাজ ও মানুষের সংস্রব ত্যাগ করে নির্জনে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকাই কি সাধনা? এই প্রশ্নের উত্তরে হজরত মহম্মদ বলেন—

লারুহ বাণি যত ফিল ইসলাম।[৭]

অর্থাৎ বৈরাগ্য নয়, সংসারে মগ্ন থেকেও ঈশ্বরের আরাধনা করাই প্রকৃত সাধকের কর্ম। হজরত মহম্মদের এই বাণী সূফী সাধকগণের কাছে মান্যতা পেয়েছে। তাই তাঁরা আল্লাহের উপাসনার সাথে জগতের মানব কল্যাণের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডে নিজেদের সংযুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়
অসংখ্যা বন্ধন মাঝেমহা আনন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়।[৮]

হজরত মহম্মদ কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক নয়। তাঁর কর্মক্ষেত্র বিশাল বিস্তৃত। মানবীয় কল্যাণ সাধন, গৃহযুদ্ধ ও নৈরাজ্য মুক্ত এক স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রবর্তন, সাংসারিক দায়-দায়িত্ব—সব কিছু তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। সূফীকবি ও শাস্ত্রবিদ জালালউদ্দিন রুমি মাত্র ১৮ বছর বয়সে সংসারী হন। সংসার জীবনে তিনি মাদ্রাসায় অধ্যাপনা, খানকায় শিক্ষাদান প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থেকেছেন। উপনিষদে ঋষি কবিগণ আশ্রমবাসী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা সমাজ ও মানব জীবন থেকে একেবারে বিচ্যুত ছিলেন না। তাঁরা ঐশ্বরিক জীবনযাপন ও সংসারধর্ম পালন একই সাথে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন দিগন্ত বিস্তৃত। পারিবারিক জমিদারি দেখাশোনার সূত্র ধরে যে কর্ম জীবনের সূচনা, শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী আশ্রম ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর পরিপূর্ণতা। সাহিত্যসৃজনে নানা শাখায় তাঁর লেখনী অতুলনীয়। তিনি বিশ্বকবি, সেরা প্রাবন্ধিক, শ্রেষ্ঠ গীতিকার, অনবদ্য সুরকার, অনুপম ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পের রূপকার—তালিকার সমাপ্তি সম্ভব নয়। সমসাময়িক বাংলা ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনেও তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই কর্মজীবন ও সাহিত্যসৃজনের সাথে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন ছিল একসূত্রে গাঁথা। সূফী সাধকগণ আল্লাহ সৃষ্ট জগতকে অবলম্বন করেই ঐশীলোকে পৌঁছাতে চান। গীতাঞ্জলিতে পরিস্ফূট হয়েছে বিশ্বমানবের সাথে যোগ স্থাপনের ব্যাকুলতা—

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।[৯]

ওমর মৈয়াম, হাফিজ, সাদী প্রমুখ প্রখ্যাত সূফী কবিদের মতো রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ঈশ্বরকে 'প্রিয়', 'প্রভু', 'অন্তর্যামী'—প্রভৃতি সম্বোধন করে মনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন।

সূফী সাধনার অন্যতম পন্থা হল 'ইনসানে কামিল'—অর্থাৎ পরিপূর্ণ মানব হয়ে ওঠা। প্রশ্ন হল, এই পূর্ণ মানব কি? প্রাচীন সূফী সাধক ইব্‌নূন্দ আরবী আল্ ইনসানুল এই তত্ত্বের প্রবর্তক। অধিকাংশ সূফী সাধনকগণই এই তত্ত্বকে মান্যতা দিয়েছেন। এই তত্ত্বের সার কথা হল, আল্লাহ্ নিরাবয়ব, অদ্বিতীয়—তিনি ভেদ ও বহুত্বের মধ্যে বিরাজ করেন। অর্থাৎ, পূর্ণ মানবরূপে আল্লাহ তাঁর সমুদয় গুণাবলি ব্যক্ত করেন—পূর্ণ মানবের মধ্যে আল্লাহ্ স্বীয় স্বরূপকে পূর্ণ প্রকাশিত করেন। মানবের মধ্যে আত্মার জাগরণ ও মানবিক বোধের চরমোৎকর্ষ সাধনাই হল পূর্ণ মানবের বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বকে কাব্যরূপ দিয়েছেন—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।[১০]

সূফী দর্শনে ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। জীব স্বয়ং ঈশ্বর—ঈশ্বর বাইরের জগতের কেউ নন। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানে উপাস্য ও উপাসক এক হয়ে যায়—

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে,
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।[১১]

এই গানে অহংকার বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরের সাথে লীন হয়ে যাওয়ার আকুতি রবীন্দ্রনাথের—সূফীবাদের ভাষায় তা হল 'ফানাফিল্লাহ'—আল্লাহ্‌র সাথে লীন হয়ে যাওয়ায় অমরত্বে বিশ্বাস করেন সূফী সাধকগণ।

কেবলমাত্র ধ্যানে-জ্ঞানে, চিন্তা-চেতনায় নয়, পোশাক ও আচরণেও সূফী প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর লক্ষণীয়। ঠাকুরবাড়ির পোশাক বানাতেন ফতেউল্লাহ। মুসলিম দর্জি। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে ফতেউল্লাহ ঠাকুরবাড়ির পুরুষদের পোশাক বানাতেন। পুরুষদের পোশাকের style ছিল পুরোপুরি মুসলিম সংস্কৃতির, বিশেষতঃ সূফী সাধকদের ন্যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম অধ্যায় থেকে শেষদিন পর্যন্ত সূফী পোশাকের প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষণ।

রবীন্দ্র জীবন চর্চা বিশ্লেষণ ও রবীন্দ্রসাহিত্য নিবিড় পাঠে যে বিষয়টি অনুধাবন করা যায় তা হল, রবীন্দ্রচিন্তা ও চেতনায় সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং সর্বাঙ্গীন মানব কল্যাণ। জীবন যাপনে, সাহিত্য চর্চায় রবীন্দ্রনাথ এই মানবতাবাদেরই জয়গান করেছেন বারংবার। দেশ-কালের কোনও সীমারেখায় তাঁর মানবকল্যাণ বোধ সীমিত নয়, তা বিশ্বজনীন। তাঁর নিজের ভাষায়—

> দুটো বিষয় নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির, একই সঙ্গে সে প্রকৃতির উপরের। একদিকে সে কায়া-বেষ্টিত, অন্যদিকে সে কায়ার চেয়ে বেশি। মনুষ্যত্বের মূলে আর একটি দ্বন্দ্ব আছে—যাকে বলা যায় প্রকৃতি ও আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক আর পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক ও মুক্তির দিক—এই দুইয়ে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে। কিন্তু সুখ-স্বার্থে মানুষের স্থিতি নেই—তার থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য মানুষকে বন্ধনের পর বন্ধন ছেদন করতে হবে—বিশ্বের সঙ্গে মঙ্গল-সম্বন্ধে যোগযুক্ত হয়েই মানুষকে মুক্তি লাভ করতে হবে, তাতেই তার মঙ্গল।[১২]

বিশ্বমানবের মঙ্গলসাধনার নিগূঢ় বাসনাতেই রবীন্দ্রনাথ সূফী সাধকের ও সূফী আদর্শের সাথে একাত্ম হয়ে যান। তাঁর জীবন ও সাহিত্য-সৃজনেও তাঁরই প্রকাশ। ব্রতীশ ঘোষের মতে—

> সূফীবাদের ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান, ঈশ্বর সম্বোধন, অহংমুক্তি, পূর্ণ মানব বিশ্বাত্মবাদ প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্র মানসের যোগ আছে। কিন্তু রবীন্দ্র উপলব্ধি তথা ইন্দ্রিয়াতীত অতীন্দ্রজ্ঞান তাঁর কাব্যে মন্দাকিনী ধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে আপন পথ কেটে।[১৩]

আপন পথের পথিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা সাহিত্য কর্মে এভাবেই সূফীবাদকে নিজ আঙ্গিক ও চেতনায় ঋদ্ধ করে নবরূপ দান করেছেন। আলোচনার উপান্তে উল্লেখ করা যায় শেখসাদীর মন্তব্যকে। তাঁর মতে—

> সব মিলিয়ে উপনিষদ ও সুফিবাদের মিলনে গড়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি জগৎ। যা অদ্বৈত। তিনি হয়ে উঠলেন ভাব ও রস জগতের সার্থক রূপকার। মুসলিম সুফিরা যেমন নাচ গান করে স্রষ্টার সাথে যেভাবে মিলিত হতে চান, রবীন্দ্রনাথ সেই পথেই এগুলেন। কবিতা, গান ও ছবিতে এই ইচ্ছার উজ্জ্বল উপস্থিতি।[১৪]

রবীন্দ্রনাথ সূফী ধর্মকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন এবং নিজ জীবন ও সাহিত্য কর্মে তাকে প্রয়োগ করে প্রসারিত ও প্রচারিত করেছেন। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে বাউল, ভক্তি, মানবতাবাদী, অহিংস আন্দোলন গড়ে ওঠে, তা প্রকৃত পক্ষেসূফী সাধনা ও সূফী আন্দোলনের উত্তরাধিকার।

তথ্যসূত্র :

১. ব্রতীশ ঘোষ, 'সূফী-ধর্মের আলোকে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' অচিন প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০১২৭, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল : ২০১৭, পৃ. ১৪।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা' কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা-৭০০০০৯, গীতবিতান : প্রবাহিনী, পৃ. ৬৩২।

৩. Dr. Nihar Ranjan Ray, 'An artist in life', Publisher : University of Kerala, 1st publication, 1967, p. 342

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মানুষের ধর্ম,

৫. শেখ সাদী, 'রবীন্দ্রনাথের সুফীয়ানা', কথাপ্রকাশ, ৩৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৯।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা' কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা-৭০০০০৯, গীতবিতান : প্রবাহিনী, পৃ. ৬৩৩।

৭. ব্রতীশ ঘোষ, 'সূফী-ধর্মের আলোকে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' অচিন প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০১২৭, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল : ২০১৭, পৃ. ২০।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা' কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা-৭০০০০৯, নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থ : মুক্তি কবিতা, পৃ. ৬৭৬-৩৭৭।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা' কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা-৭০০০০৯, 'গীতাঞ্জলি', পৃ. ৪৪০।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা' প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০।
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন-২ গ্রন্থের দ্বিধা প্রবন্ধ।
১৩. ব্রতীশ ঘোষ, 'সূফী-ধর্মের আলোকে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' অচিন প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০১২৭, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল : ২০১৭, পৃ. ২৮।
১৪. শেখ সাদী, 'রবীন্দ্রনাথের সুফিয়ানা', কথাপ্রকাশ, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৬।

তনুকা চৌধুরী
অংশকালীন অধ্যাপিকা
বাংলা বিভাগ, রাণী ধন্যাকুমারী কলেজ
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

মহাশ্বেতা দেবীর মাস্টার সাব : প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর

চঞ্চল মণ্ডল

বাংলা উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের কথা যে সব সাহিত্যিকেরা তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মানব কল্যাণের দায় স্বীকার করতে গিয়ে তাঁর লেখার বিষয় হয়েছে প্রান্তিক মানুষের কথা। স্বাভাবিক ভাবেই উপন্যাসের বিষয় হয়েছে বঞ্চনার ইতিহাস, রাজনীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, কিংবদন্তী, লোকসংগীত, পুরাণ কথা ইত্যাদি। উপন্যাসের অবয়ব তৈরি হয় গল্প দিয়ে। এই গল্প সামাজিক, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, ঐতিহাসিক, লৌকিক, অলৌকিক, শোষক শ্রেণি, প্রান্তিক বা নিপীড়িত শ্রেণি ইত্যাদি নানা প্রকার হয়। এ প্রসঙ্গে ই. এম. ফস্টার বলেছেন—

> "We shall all agree that the fundamental aspect of the novel is story-telling aspect, but we shall voice our assent in different tones..."[১]

উপন্যাসে কাহিনির বয়ন তৈরি হয় মানুষের জীবনকথা দিয়ে। যে জীবন সমাজ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। সময় ও সমাজের প্রতি অনুগত জীবনের সূত্রেই প্রান্তিক মানুষ তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয়েছে। মহাশ্বেতার 'অরণ্যের অধিকার', 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', ' চোট্টিমুণ্ডা এবং তার তীর', হুলমাহা, টেরোড্যাকটিল, 'পূরণ সহায় ও পিরথা' ইত্যাদি অসংখ্য উপন্যাসে আদিবাসী প্রান্তিক মানুষের কথা উঠে এসেছে। কিন্তু তাঁর 'মাস্টার সাব' উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের কথা উঠে এসেছে ভিন্ন স্বরে। এই প্রান্তিক মানুষকে নিয়ে তাঁর লেখালেখি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> "..... আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় বারবার ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ, যাদের আমি বলি, The Voiceless Section of Indian Society। এই অংশ এখনও শুধু নিরক্ষর, স্বল্প স্বাক্ষর ও অনুন্নতই নয়, মূল স্রোতের থেকে এরা বড়ো বিচ্ছিন্ন। অথচ ভারতীয় সমাজের এই অংশকে না জানলে ভারতকে জানা যায় না। আমি পারি কিনা জানি না, চেষ্টা করি মাত্র। ...."[২]

মহাশ্বেতা দেবীর 'মাস্টার সাব' উপন্যাসে যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে পেয়েছি এদের কথা বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজ মনে রাখে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বারা এই মানুষগুলি নিরন্তর অবহেলিত, অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত। এই বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বরকে তথাকথিত সভ্য ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায় ও দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। সাধ্যমত তিনি এই প্রান্তিক মানুষের কথা বলেছেন।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র নারীরাই লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হয় এমন নয়। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সকল শ্রেণির মানুষই সমাজের বিত্তবান শ্রেণি ও রাষ্ট্রের দ্বারা শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার। 'মাস্টার সাব' উপন্যাস প্রান্তিক মানুষের উপর অত্যাচার ও বঞ্চনার জীবন্ত দলিল। এখানে উঠে এসেছে প্রান্তিক হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষের কথা। তাদের শারীরিক, অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি পরিবারের মেয়ে বউদের ওপর পাশবিক অত্যাচার এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই, প্রতিবাদ ও প্রতিকার প্রকাশ পেয়েছে এই উপন্যাসে। 'মাস্টার সাব' উপন্যাসে মহাশ্বেতা মানুষের মধ্যে চেতনার বীজ বপন করে উপন্যাস ভিন্ন মাত্রা দিয়েছেন।

উপন্যাস শুরু হয়েছে মায়ের কাছে ছেলের গল্প শোনার আবদারের মধ্য দিয়ে। ছেলে মায়ের কাছ থেকে আর কোন পুরনো গল্প শুনতে চায় না। সে শুনতে চায় নতুন নতুন গল্প। মা ছেলেকে মাস্টার সাবের গল্প বলে। মাস্টার সাবের কাহিনি চির নতুন। সে বেঁচে আছে হরিজন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে। এখন প্রশ্ন কে এই মাস্টার সাব? এ প্রশ্নের উত্তর কি বড়ই কঠিন? না মাস্টার সাব কম্যুনিস্ট নয়। আগে তো কম্যুনিস্ট ছিল না। সে ছিল বিহারের ভোজপুর জেলার

মণ্ডল, চঞ্চল : মহাশ্বেতার মাস্টার সাব : প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 1, June 2020, Page : 24-31, ISSN 2249-4332

একোয়ারি গ্রামের গরিব কিষাণ পরিবারের ছেলে জগদীশ মাহাতো বা জগু মাহাতো। হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলে তার আবার লেখাপড়ার কি দরকার? কিন্তু না, মালিকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে লেখাপড়া শিখে ছেলেটা আরা শহরের জৈন স্কুলের মাস্টার হয়েছিল। সেই থেকে একোয়ারি গ্রামের হরিজন জগদীশ মাহাতো হয়ে গেল মাস্টার সাব। একটা বিয়েও সে করেছিল। গ্রামবাংলায় হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় কম বয়সে। নিজের মেয়ে পরের ঘরে যাবে আর অন্য একটা মেয়ে ঘরে না আনলে এদের চলে না। সে এসে ঘর-দোরে ঘুরবে, দেওয়ালে চিত্র করবে, ঘরের কাজে হাত লাগাবে তাহলে পরিবারের সকলের ভালো লাগবে। মাস্টার সাব কোন দিনই কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিল না। কোন দিন সে ভাবেনি নিরন্ন ক্ষেতমজুরদের বলবে—

> ''চলো! উঠাও বন্দুক। তুমি বন্দুক উঠালে মালিক ডরে যাবে।''[৪]

নিজের সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবন ফেলে মাস্টার সাবকে হাতে বন্দুক তুলে নিতে হয়। ছোট বেলায় নিজের চোখে দেখা হরিজন সম্প্রদায়ের ওপর জোতদার ও মালিক শ্রেণির অত্যাচারের কথা সে ভুলতে পারে না। সে একা সুখে থাকতে চায়নি। সমগ্র হরিজন সমাজকে জোতদার মালিক শ্রেণির অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। ছোটবেলায় সে শুনেছে ভকতলাল রামের কান্না। বাইরের গাছতলায় বসে সে কান্না করছিল। জগুর বাবা তাকে হাত ধরে তুলে এনেছিল নিজেদের বাড়ি। এনে জল ও বিড়ি খেতে দেয়। ঘুমানোর ভান করে জগু তার বাবা ও ভকতরামের সব কথা শুনতে পায়। ভকতরাম তার বাবাকে বলেছিল লছমন সিং-এর কথা। সে দুসাদ-মুচি ধোবিদের ছায়া পড়লে লাথি মারে আবার তাদের ঘরের মেয়ে বউদের লালসার শিকার বানায়। তার স্ত্রীর উপর যেদিন থেকে লছমন সিং-এর নজর পড়ে সেদিনই সে বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরে লছমন সিংকে সে মনে মনে দশবার খুন করেছে। কিন্তু যেদিন তার ঘরে লছমন সিং ঢুকে গেল সেদিন সে কিছুই করতে পারল না। হরিজন সম্প্রদায়ের দুর্বিসহ যন্ত্রণার চিত্র ফুটে উঠেছে ভকতলালরাম ও তার বাবার কথোপকথনের মধ্যে—

> ''শালারা আমাদের পুরুষদের জানোয়ার মনে করে যে, স্বামীর পাশে আছে, তাকে টেনে নেয়। আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না। বাচ্চারা আছে।
>
> জগুর বাবা বহু দশকের অভিজ্ঞতায় সহিষ্ণু, বেদনার্ত গলায় বলেছিল, মেয়েরা ক্ষেতে কাজ করে, সেখানে। রাতে তো ভালো, ছেলে পিলে ঘুমায়। দিন দুপুর মানে না।''[৫]

অত্যাচারের মাত্রা কোন পর্যায়ে পৌঁছলে এরকম কথাবার্তা হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই মর্মান্তিক কথোপকথনের মধ্যেই সে শুনেছিল ভকতলাল রাম তার বাবার কাছে এঘটনা থেকে নিস্তারের উপায় জানতে চেয়ে নিজেই লছমন সিংকে মারতে চায়। কিন্তু মালিকের বন্দুকের ভয় পায়। বুনো জন্তুর মতো আক্রোশে সে তখন আর্তনাদ করে কেঁদে বলে ওঠে—

> ''কোন বিচার নেই দেশে, ভগবান! চার পাঁচজন মানুষ সকলের উপর জুলুম করে চলবে?''[৬]

এ ঘটনা জগুর মনে আগুন জ্বেলে দেয়। সারা জীবনেও সে একথা ভোলেনি। আরও বড় হলে সে দেখেছে লেখাপড়া শিখলেও সে নাথুনি সিংদের চোখে হরিজনই থাকবে। শুধু তাই নয় এখন সে নিজের চোখে দেখতে পায় তাদের মেয়েদের উপর হয়ে চলা লাঞ্ছনা। মালিক শ্রেণি কিভাবে তাদের মেয়েদের উপর ইচ্ছা মত পাশবিক অত্যাচার করে। ঘরে বাইরে কোথাও হরিজন মেয়ে-বউরা নিরাপদ নয়। যে কোন সময় তারা মালিকের লালসার শিকার হতে পারে।

জগু মাহাতো এসব ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখ পায়। মনের দুঃখে ছোটবেলার মাস্টারজির কাছে গিয়ে অভিযোগ জানায় যে সংবিধানে লেখা এ ভারতে সকল মানুষ সমান একথা সত্যি নয়। তাদের অঞ্চলে যে ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলে সে ঘটনা একথা প্রমাণ করে না।

আহীরটোলির সরযূ বিধবা হয়ে বাপের ঘরে ফিরে এলে লছমনের ভাই তার ধর্মনাশ করে। এ ঘটনায় ফৌজ থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেওয়া রামেশ্বর আহীর কেস করতে গেলে পুলিশ রিপোর্ট না লিখে তাকে ভাগিয়ে দেয়। জগু তার মাস্টারের কাছে জানতে চায়—'এই রকম বর্বরতা শাস্ত্র অনুমোদন করে কিনা।' মাস্টারজি জগুকে জানান যে নারীর উপর

লাঞ্ছনা করে কেউ পার পায় না। সীতাকে নিগ্রহ করে রাবণ ধ্বংস হয়। দ্রৌপদীর কারণে কুরুবংশ ধ্বংস হয়। একথা শুনে জগু মাহাতো বলে—

> ''এ তো নারী নির্যাতন নয় মাস্টারজি, পুরুষ নির্যাতনও একই সঙ্গে। জীবজন্তু একটা সময় পৌঁছলে সম্বন্ধ বাছে না। এরা রাতে ঢুকে যায় আমাদের টোলিতে। স্বামী পড়ে থাকে ঘুমের ভান করে। আপত্তি জানালে গুলি খাবে। নয়তো মিথ্যে চুরির দায়ে যাবে হাজতে। দিনে মেয়েদের ধর্মনাশ করে খেতি কাজের সময়। বাপ-ভাই-স্বামী, এদের বুকে আগুন জ্বলে না?''[৭]

মাস্টারজি একথা শুনে জগুকে তাদের গ্রামের একটি ধোবী মেয়ের কাহিনি শোনায়। সে কাহিনি আরও ভয়াবহ। ধোবিনের উপর অত্যাচার করলে সে মারা যায়। তার পেটে বাচ্চা ছিল। মেয়েটি স্বামী ও শ্বশুরকে নিয়ে সে দেবী রায়ের নামে কেস করে। পুলিশ উকিল সকলেই বলে দেবী রায়ের যাবজ্জীবন অথবা দশ বছরের কারাদণ্ড হবেই। সে সাইকেল বিক্রি করে, ধার করে উকিলের খরচ জোগায়। কিন্তু দেবী রাই দারোগাকে কিনে নেয়। ধোবিদের মেরে হুমকি দিয়ে বোবা করে দেয় এবং তাকে মেরে-ধরে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

জগু বুঝতে পারে তাদের সমাজের মেয়ে বউদের ওপর এ অত্যাচার আদিকাল থেকেই চলে আসছে। আর হরিজন সহ অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা এ ঘটনা তাদের অদৃষ্ট বলে মনে করে। জগু মাহাতো ইতিমধ্যে আরা শহরের জৈন স্কুলে মাস্টারি পায়। সে ছেলে মেয়েদের পড়াতে থাকে এবং কিভাবে নিজ সম্প্রদায়ের মেয়েদের উপর হওয়া অত্যাচার বন্ধ করা যায় সেই চিন্তায় মশগুল থাকে। স্কুলে সে পায় সহকর্মী দলীপকে। সে জগদীশের মনের অবস্থা বুঝতে পারে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকও জগুর প্রতি সহানুভূতিশীল। জগু মাহাতো একদিন রামেশ্বর আহীরের সঙ্গে দেখা করে। রামেশ্বর ফৌজ থেকে অবসর নিয়ে ডাকাত বনে গেছে। তারা হরিজন সম্প্রদায়ের মেয়েদের উপর হওয়া জুলুম বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর। তারা জানে পুশিশ তাদের কোন রকম সাহায্য করবে না। মালিকপক্ষ বন্দুক দেখাবে। কিন্তু মানুষের মনে সাহস আনতে পারলে অত্যাচার বন্ধ হবেই। হরিজন হয়ে জীবন কাটানো জগুর কাছে অভিশাপ মনে হয়। মেয়ে বউদের ইজ্জত থাকে না, থাকে না জমি আর জীবনের অধিকার। এদের দুঃখ কখনো ঘোচেনা। জগু পণ করে এই দুঃখ ঘোচানোর।

শুধু ঘরের মেয়ে বউদের উপর অত্যাচার নয়, হরিজন সম্প্রদায়ের প্রান্তিক মানুষের উপর একোয়ারি গ্রামের নাথুনি সিং ও তার সাগরেদ শিউপূজন, হরপুরার মহাজন মালখান সিং, সারথার সুদখোর মালিক অবধনারায়ণ, মহাজন লছমন সিং, মোর গ্রামের নন্দু ভকত সকলেই অকথ্য নির্যাতন করে। সামান্য পরিমাণ ধান অথবা অতি সামান্য কয়েকটি টাকা ধার দিয়ে ক্ষেতমজুর হরিজন ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের সারা বছরের জন্য ঋণের জালে আবদ্ধ করে রাখে। ক্ষেতমজুরদের ন্যায্য মজুরি দেয় না। বিনা মজুরিতে মালিকের ক্ষেতে কাজ করতে বাধ্য করে। এছাড়া প্রান্তিক হরিজন ও অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সামান্য চাষের জমিটুকু পর্যন্ত তারা দখল করে নেয়। শুধু তাই নয় জোতদার মালিক বা মহাজনের বাড়িতে যে কোন উৎসব অনুষ্ঠান হলে এদের কাছ থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে অর্থ আদায় করে। নিজ সম্প্রদায়ের এই দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত জীবন জগদীশ মাহাতো অত্যন্ত পীড়িত করে। সে হরিজন সম্প্রদায়ের সবাইকে সংঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করে।

মাস্টার সাব তার স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে চাই নারীর ওপর অত্যাচারের কথা শাস্ত্রে আছে কিনা। সংস্কৃত শিক্ষক জানায় শাস্ত্রে তো রাজরমণীদের কথা আছে। সীতা, দ্রৌপদী সবাই ছিল রাজবংশের তাই এদের ওপর অত্যাচার করলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সুগ্রীব বালির মৃত্যুর পর তারাকে বিয়ে করে নিলেও, তাতে তার কোন ক্ষতি হয়নি। সুগ্রীব রাজাই থেকে যায়। জগু শাস্ত্রে শূদ্র রমণীর উপর অত্যাচারের কোন কথা আছে কিনা জানাতে বলে। একদিন সংস্কৃত মাস্টার জগুকে জানায়—

> ''দেখ হে! মনুস্মৃতিতে বলছে শূদ্র রমণীদের অবমাননা নিষিদ্ধ।''[৮]

এবার যেন জগদীশ নিশ্চিন্ত হল। সে জানতো হরিজনদের একত্রিত করার জন্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা জরুরি।

একোয়ারি গ্রামের মুখিয়া রামনরেশ রাম। সে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। তার জন্যই জগু স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে ভোটের জন্য গ্রামে ফিরে আসতে চাইলে সহকর্মী দলীপ শহরে থেকে নিজের কেরিয়ার তৈরির কথা বলে। একথায় জগু দিলীপকে বলে যে তার গ্রামের সাড়ে পাঁচ হাজার মানুষের নিরুপায় চাউনি এবং নিচু মাথা তাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। এখানে থেকে নিজের উন্নতি করতে থাকলে গ্রামের মানুষের সঙ্গে বেইমানি করা হবে। একোয়ারি গ্রামে ফিরে রামনরেশ রামের সঙ্গে পরামর্শ করে। অন্য দিকে আছে জমি মালিকদের মদতপুষ্ট প্রার্থী রাজদেও। জগদীশ মাহাতো রামনরেশকে বলে নির্বাচনি প্রচারে ভূমি বন্টন, ন্যায্য ক্ষেতমজুরি, হরিজন নিপীড়ন বন্ধ, চাষি উচ্ছেদ বন্ধ, এইসব বিষয়ে জোর দিয়ে প্রচার চালাতে হবে। বিশেষ করে প্রচারে জোর দিতে হবে মেয়েদের ধর্মনাশের প্রতিবাদে এবং সঠিক মজুরের দাবী জানিয়ে। এই ভোটের প্রচারের মধ্য দিয়ে মাস্টার সাব জোর সওয়াল করে রামনরেশের পক্ষে ভাষণ দেয় বিরোধী প্রার্থীকে কেন ভোট দেবে না সেই যুক্তি দেখিয়ে। কারণ বিরোধী প্রার্থীকে মালিক শ্রেণি মদত দিচ্ছে। যে মালিকরা তাদের মেয়ে-বোন-স্ত্রীদের ইজ্জতের দাম দেয় না তাদের মদতদাতা প্রার্থীকে ভোট দিতে নিষেধ করে। মাস্টার সাবের ভাষণ—

> "ঘরে ঘরে মেয়েদের চোখের জল ফেলাবে, পুরুষদের তুচ্ছ করে হাসবে, আর তাদের প্রার্থীকে ভোট দেব আমরা? আমি আরায় শাস্ত্র পড়েও দেখে নিয়েছি, আমাদের মেয়েদের ছোঁবার অধিকার ওদের নেই।"[৯]

মাস্টার সাব ভোটের প্রচারের মধ্যে হরিজন সম্প্রদায়কে সংগঠিত করতে থাকে। জোতদার নাথুনি সিং চুপ করে বসে থাকে না। সে তার সাগরেদ শিউপূজনকে দিয়ে মাস্টার সাবকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু রামেশ্বর আহীরের উপস্থিতি এই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ভোটে রামনরেশ রাম বিজয়ী হয়। এই প্রথম জোতদার মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে হরিজন সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সফলতা। কিন্তু এই সফলতা অর্জনের জন্য মাস্টার সাবকে পাঁচ মাস হাসপাতালের বেডে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়। মাস্টার সাবের শরীর ভেঙে পড়ে। সে আমাশয় কষ্ট পেতে থাকে। রামেশ্বর আহীর, আনন্দ চামার, লোহ চামার, রামনরেশ রাম সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আনন্দ চামার জগু মাহাতো ওরফে মাস্টার সাবকে বেল খাওয়ার পরামর্শ দেয়। বেল খেলে পেটের সব রোগ সেরে যাবে। বেল হল পেটের মহৌষধ।

মাস্টার সাব ভোজপুরের মানুষের উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিকার করতে সচেষ্ট হয়। ভোজপুরের খাজনা ওঠাবার ভার কম্পানি ডুমরাওঁইয়ের দোস্ত দেওয়ান সিংকে দেয়। দোস্ত সিং-এর অত্যাচারের কাহিনি আজও ভোজপুরের মানুষের মুখে মুখে গান হয়ে রয়েছে। রামেশ্বর আহীর গেয়ে ওঠে—

> " দোস্ত দেওয়ান সিং ঢোলসোহর দেয়
> শতকরা পঁচাত্তর ভাগ আমার খাজনা
> দেওয়ান সিং দোস্ত ঢোল সোহর দেয়।"[১০]

শুধু খাজনা দাবী করেই দেওয়ান সিং-রা থেমে থাকে না। তারা এই খাজনা আদায় করতে কিষাণের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। দোস্ত দেওয়ান পরিবারের মাথা মহারাজা বিক্রমজিৎ সিং। এই বিক্রমজিতের অত্যাচারের কাহিনিও লোকমুখে আজও প্রচলিত—

> " কে বলবে বিক্রমজিতের কথা?
> তাকে খাজনা দিতে দিতে
> খাজনা দিতে দিতে
> কিষাণের ঘরে থাকতো তুষ...
> .... কেউ জন্মালে, কেউ মরলে
> তখনো কিষাণ দিয়ে চলত খাজনা।"[১১]

এই অত্যাচার আজও চলে আসছে। তখন ছিল দোস্ত সিং, মহারাজা বিক্রমজিত সিং। এখন নাথুনি সিং, শিউপূজন সিং,

অবধনারায়ণ, মালখান সিং, লছমন সিং, নান্দু ভকতের মত অসংখ্য মানুষ। এই অত্যাচার প্রতিহত করার জন্য জগু মাহাতো হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষদের সংগঠিত করে।

মাস্টার সাবের এই চেষ্টা সফল হতে থাকে। নাথুনি সিং সহ মালিক শ্রেণির মদতপুষ্ট প্রার্থী রাজদেও পরাজিত হলে হরিজন মানুষেরাও সম্মিলিত শক্তিতে প্রতিরোধ সম্ভব তা বুঝতে পারে। দীর্ঘদিন মালিক শ্রেণির কোন মানুষ তাদের ঘরের মা-বোন-স্ত্রীদের বেইজ্জতি করার সাহস পায় না। গ্রামের পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের মধ্যেও প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায়। লছমন সিংয়ের মতো মানুষের এতদিন বিনা বাধায় হরিজন মেয়ে-বউদের ইচ্ছামত লালসার শিকার করেছে। কিন্তু এখন তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। একদিন পড়ন্ত বিকেলে আমবাগানের শুকনো পাতা কুড়ানোর সময় মঞ্চালী দুসাদিনকে ধরে টানতে গিয়ে লছমন সিং হঠাৎ বেজায় ঘাবড়ে যায়। মঞ্চালীর প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায়—''ছাড়ো আমাকে, ছোঁবে না। বলে ফুঁসে ওঠে এবং ছুটে নয় হেঁটেই চলে যায় হনহনিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে।''[১২]

বেশ বোঝা যায় গ্রামের রীতিনীতি পাল্টে যাচ্ছে। মাস্টার সাবের চেষ্টা সফল হতে শুরু করেছে। দলীপের আর্থিক সাহায্য নিয়ে সে হরিজনদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরতে 'হরিজনিস্তান' কাগজ বের করে। প্রান্তিক মেয়ে-বউদের মধ্যেও মালিক শ্রেণির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস সঞ্চার হতে শুরু করে। ইতিমধ্যে একদিন লছমন সিং-এর খড়ের গাদায় রহস্যজনকভাবে আগুন ধরে যায়। তারপর মঞ্চালীর ঘটনা। এদিকে লছমন সিংয়ের খড়ের গাদা জ্বলে গেলেও কোন জুলুম হলো না, আবার মঞ্চালীর ঘটনায় দুসাদ টোলিতে হামলা হলো না, এতে গ্রামের মানুষের মধ্যে আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া হয়। তারা তাদের ভিতরে লুকিয়ে থাকা প্রতিবাদী সত্ত্বাকে বাইরে টেনে আনতে সমর্থ হয়। তারা অন্তর থেকে গেয়ে ওঠে—

" উত্তরে বাতাসে যেমন জীর্ণ পাতা খসে পড়ে
পৌঁছিয়া যেমন উড়ায় আবর্জনা
তেমনি করে চলে যাচ্ছিল ভয়
ভয় জমতে লাগে কয়েক জন্ম
ভয় খোয়াতে লাগে কয়েক দিন
মাস্টার সাব শিখিয়েছিল।''[১৩]

হরিজন সম্প্রদায়ের মা-বোন-স্ত্রীরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। একোয়ারি গ্রামে মেয়েদের প্রতিবাদের এক নতুন চিত্র দেখা যায়। শিউপূজন সিং সন্ধ্যার সময় ভাঙ্গি টোলিতে মহুবনের ঘরে ঢুকেছিল। বউটি কুলোয় ডাল বাছছিল। শিউপূজনকে দেখে সে বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু তার ঝাঁঝালো কণ্ঠ শুনে শিউপূজন তাকে ঠাণ্ডা করে দিতে চায়। একথায় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে—

> ''বউটি উনোন থেকে জ্বলন্ত চেলা কাঠ তুলে নিয়ে ওকে তাড়া করে এবং আকাশ ফাটিয়ে 'চোর চোর!' বলে চিল মারে।''[১৪]

এই পরিস্থিতিতে শিউপূজনের পিছন পিছন পাড়ার কুকুরগুলো তাড়া করে। দৌড়ে পালানোর সময় সে মহুবনের বাড়ির কাঁচা মলের গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। মলের গর্তের মধ্যের পোকা-মাকড়ের কামড় খেয়ে আপাদ-মস্তক মল মেখে নাকাল হয়ে চলে যায়। ভোর থাকতে থাকতে সে হাজামের কাছে গিয়ে মাথা কামিয়ে আসে।

মাস্টার সাব এবার ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। পাঁচ ঘর মালিক, পাঁচ হাজার মানুষকে খাটায়। মালিক শ্রেণি তাদের জমি বাড়িয়েই চলে। ফসল কাটার মরশুমে মালিকরা পাঁচ সিকা মজুরি দেয়। কিন্তু সরকারি রেট মেয়ে-মরদ চার টাকা-পাঁচ টাকা। মাস্টার সাবের নেতৃত্বে সঠিক মজুরের দাবিতে শ্রমিকরা হরতাল করে। কিন্তু নাথুনি সিংয়ের কূট চক্রান্তে গোপাল গোমস্তার সাহায্যে হরতাল বানচাল হয়। গোপাল গোমস্তা সকল মালিকের ভাও খাতা নিয়ে টোলিতে টোলিতে ঘুরে ঘুরে মিষ্টি কণ্ঠে বলে—

" এই নে, ধান নে, করজ নয় খেতে দিয়েছে
এই নে, এক এক টাকা, করজ নয় খেতে দিয়েছে
খুব ভালো লোক জগদীশ মাহাতো
তার হরতাল ডাকে এতসব পেলি।।"[১৫]

কিন্তু অল্প দিনেই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। এইসব ধান ও টাকা আবার হরিজন সম্প্রদায়ের ঋণের খাতায় জমা পড়ে যায়। তবু মাস্টার জগু মাহাতো ভেঙে পড়ে না। সে পুনরায় আন্দোলনে নামার জন্য তৈরি হয়। ১৯৬৯ সালে স্কুলের পাঠ চুকিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে সে গ্রামে ফিরে আসে। ফেরার সময় ট্রেনের মধ্যে সে শুনতে পায়—

"কে এক মাস্টার সাব নাকি হরিজনদের মনে ভরসা দিয়েছে। তাতে একটা আঞ্চলিক পাপ দূর হয়েছে। হরিজন মেয়েদের আর ইজ্জত কেড়ে নেয় না কেউ।"[১৬]

একথা শুনে সে মনে মনে খুশি হয়। গ্রামে ফিরে সে শুনতে পায় সাহার ব্লকের বাইরেও তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে কেউ তাকে চেনে না কিন্তু সকল হরিজন তাকে শ্রদ্ধা করে। তার আগমন সংবাদে সকল হরিজন মানুষ তার বাড়িতে হাজির হয়। সে বলে হরতালে জিততে না পারলেও তারা যে লড়াই শুরু করেছিল তাতে তাদেরই জিত হয়েছে। সামনে আরো বড় আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। মালিক শ্রেণি পুনরায় তাদের উপর আঘাত হানার আগেই তারাই মালিকের উপর আঘাত হানবে। কিন্তু হরিজনদের তো কাস্তে ছাড়া অন্য অস্ত্র নেই। মাস্টার সাব সকলেরই অস্ত্র আছে বলে আশ্বাস দেয়।

" মাস্টার সাব বলে, তোমার হাতে দেবো বন্দুক
শিখাব বন্দুক উঠাতে, শিখাব নিশানা দেখতে,
শিখাব গুলি মারতে, এক গুলিতে নিশানা খতম।।"[১৭]

গ্রামের সকলকে সে বলে যে বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। এই 'নারা' আত্মস্থ করে নব উদ্যমে প্রান্তিক হরিজন মানুষেরা মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।

মাস্টার সাব, রামেশ্বর, আনন্দ, সাহার পিরি সান্দেস তরাই ঘুরে ঘুরে আন্দোলন শুরু করে। করণ ও প্রয়াগ একোয়ারি থেকে যায়। সবাই বন্দুক চালানো শিখতে থাকে। বন্দুক তুলে ধরে নিশানা ঠিক করে চালাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ভোজপুরে গুলি ও বন্দুকের অভাব নেই। এতদিন এই বন্দুক ছিল মালিক শ্রেণির কাছে। এবার থেকে হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে হাতে হাতে বন্দুক ঘুরতে থাকে। এদের হাতে বন্দুক জোগান দিতে থাকে অভয় লোহারদের মতো লোহাররা—

" অভয় লোহারের মতো লোহাররা গড়ছে বন্দুক,
চাঁদা তুলে কিনছে ওরা গ্রামে গ্রামে
এ আমাদের নিজেদের রক্ষা করবার ফৌজ
আমাদের নিজেদের ছেলেরা এর সিপাহি।।"[১৮]

প্রান্তিক মানুষেরা মালিকের দিকে বন্দুক তাক করতে প্রস্তুত। শুধুমাত্র মাস্টার সাবের আদেশের অপেক্ষা। সাহার থানার চৌরি গ্রামে গনেশী দুসাদ, লালমোহন দুসাদ, বালকেশর দুসাদ আর দীননাথ তেলির নেতৃত্বে ক্ষেতমজুর আন্দোলন সুরু হয়। বহু পুরুষ ধরে ঘটে চলা বঞ্চনার যোগ্য জবাব দিতে থাকে তারা।

নানা অঞ্চলে ঘুরে নানা আঞ্চলিক সমস্যা দেখতে পায় মাস্টার সাব। সেই সমস্যার সমাধান কল্পে সে প্রান্তিক মানুষদের সংগঠিত করে। ভোজপুরের বীর নায়িকা মহথিন দেঈকে বিহিয়া মন্দিরে শুধু পূজা দিলেই হবে না। মহথিন দেঈকে মনে রেখে ইজ্জতের জন্য রুখে দাঁড়াতে হবে। কাউকে সতী হওয়া চলবে না। বরং যারা অসৎ তাদেরকে মারতে হবে। হরিজন টোলিতে ওরা অনেক অত্যাচার করেছে এবার তার পাল্টা প্রত্যাঘাত করবে। তৈরি সবাই ছিল এবার মাস্টার সাবের নির্দেশ পেয়ে তারা সশস্ত্র লড়াই শুরু করে। হরিজন আন্দোলন, ক্ষেতমজুর আন্দোলনের জন্য হাতে অস্ত্র তুলে

নিয়ে মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে।[১৯] প্রথমে তারা একোয়ারি গ্রামের অত্যাচারী শিউপূজনকে হত্যা করে। পরদিন কানালের ধারে তার মৃতদেহ আবিষ্কার হয়। এ ঘটনায় পুলিশ সমগ্র অঞ্চলে মাস্টার সাবের খোঁজ শুরু করে। মাস্টার সাব বন্দুক ও রিভলবার আর রামেশ্বর বন্দুক নিয়ে আত্মগোপন করে। বউকে নির্দেশ দেয় লোহা, করণ, আনন্দকে বলতে একটা বন্দুকও যেন খোয়া না যায়। তারা গ্রাম থেকে অনির্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে। পুলিশ তাদের খুঁজে পায় না। নাথুনিও মুক্তারামকে পুলিশ নিয়ে থানায় যায়। তাদের এই আত্মগোপনের কথা আজও এখানকার মানুষের মুখে মুখে ফেরে—

" পুলিশ আসছে গ্রামে জগু মাহাতোর খোঁজে
পুলিশ আসছে রামেশ্বর আহীরের খোঁজে
তারা মিলিয়ে গেছে সাহার ব্লকের মাটিতে
নইলে লড়াই উঠাবে কে।"[২০]

প্রান্তিক মানুষের সমবেত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সকলেই একত্রিত হয়ে মাস্টার সাবের পাশে থাকার পণ করে। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

এবার পুলিশ মাস্টার সাবের গায়ে লেবেল সেঁটে দেয় 'নকশাল' বলে। তাদের ধারণা কিষাণ আর মজুরদের হকের জন্য যে লড়াই করছে সে নকশাল না হয়ে পারে না। মাস্টার সাবেরও প্রান্তিক মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য, তাদের রাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নকশাল হতে আপত্তি নেই। এরপর তারা একে একে হত্যা করে সারথার অত্যাচারী মহাজন অবধনারায়ণকে, হরপুরার অত্যাচারি মালিক মালখান সিংকে, মোর গ্রামের মালিকের গুণ্ডা যে নিজেই মালিক সেজে প্রান্তিক মানুষের উপর অত্যাচার করে সেই নন্দু ভকতকে, অত্যাচারী লছমন সিংকে ও বাবুসাহেবকে। পুলিশ তাকে নকশাল নেতা মনে করে। সে নকশাল? সে নকশাল হোক না হোক তার এই আন্দোলন শুরু করার পর প্রান্তিক হরিজনদের উপর জুলুম কমেছে, মেয়েদের বেইজ্জতি বন্ধ হয়েছে। এতেই সে সুখী। সমগ্র প্রান্তিক মানুষের মনে সে অধিকার রোধের চেতনা জাগ্রত করতে পেরেছে। এর থেকে বড় প্রাপ্তি তার আর কি বা হতে পারতো।

ভোজপুরের অত্যাচারী মালিকদের একে একে নিকেশ করে মাস্টার সাব দেখতে পায় পিরো, সান্দেশ, জগদীশপুর সব জায়গায় আন্দোলনের জন্য জমি তৈরি হয়ে গেছে। বাবু সাবকে মারার পর সে বুঝতে পারে শরীর তার সাথ দিচ্ছে না। সে এতদিনের নিত্যসঙ্গী রামেশ্বর আহীরকে তাকে রেখে চলে যেতে বাধ্য করে। তাকে আশ্বাস দেয় সারা জীবন রামেশ্বরের সঙ্গে থাকবে। ভোরবেলা মাস্টার সাব বিহিয়া বাজারে চা খাওয়ার সময় বাবু সাহেবের মস্তানরা তাকে দেখে ডাকু ডাকু বলে চিৎকার করতে থাকে। সে সময় মুসাহার ঢোলির মানুষেরা ডাকু ডাকু চিৎকার শুনে বেরিয়ে আসে। মাস্টার সাব প্রত্যাশা ভরা মুখ তুলে বলতে যায় 'আমি মাস্টার সাব' কিন্তু মাথায় লাঠির আঘাত পড়ে। আর বলতে পারে না। আপনজনদের হাতেই তার মৃত্যু হয়। পরিচয় জানার পর তারা হা হা করে কেঁদে ওঠে, না তারা বকশিস নেয় নি। আশেপাশের দশটি গ্রামের প্রান্তিক মানুষেরা তিনদিন না খেয়ে থাকে। চার দিনের দিন দশ হাজার মানুষ শান্তি পূজা করে।

মাস্টার সাব ছিলেন দুরুহ পথের যাত্রী। নিজ সম্প্রদায়ের প্রান্তিক মানুষদের তিনি সংগঠিত করে তাদের মধ্যে চেতনার বীজ বুনতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রান্তিক মানুষেরা এখন নিজেদের অধিকার নিজেরাই ছিনিয়ে নিতে সক্ষম। যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের সম্মিলিত কণ্ঠ জেগে উঠবে। শোনা যাবে প্রান্তিক মানুষের নির্ভীক কণ্ঠ। এই নির্ভীক কণ্ঠ মাস্টার সাব সমগ্র প্রান্তজনের মধ্যে 'রোপাই' করে গেছে। তাইতো শিশুটি মাকে মাস্টার সাবের 'কহানী' ফুরাল কিনা জিজ্ঞেস করলে মা বলে ওঠে—

" ... কেমন করে ফুরাবে, ও আমার দুলার?
ওতো নিজেকে রোপাই করে গেছে আমাদের মধে
কেমন করে ফুরাবে? ....
.... মাস্টার সাবের কহানী কেমন করে শেষ হয়?

সে যে নিজেকে রোপাই করে রেখে গেছে
ভোজপুরের গরিব ভুখা মানুষের রক্তে রক্তে।।"[২১]

তথ্যসূত্র

১. E. M. Forster, Aspect of the Novel, Penguin, London, 2000, P. 40.
২. মহাশ্বেতা দেবী, মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা, ১৯৮৪, ভূমিকার পরিবর্তে।
৩. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ), মহাশ্বেতা নানা বর্ণে ও নানা রঙে, প্রথম প্রকাশ ২০১৫, পৃ. ২৯৬।
৪. মহাশ্বেতা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, একাদশ খণ্ড, মাস্টার সাব দ্রঃ, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ২০।
৫. তদেব, পৃ. ২৩।
৬. তদেব, পৃ. ২৩।
৭. তদেব, পৃ. ২৫।
৮. তদেব, পৃ. ৩০।
৯. তদেব, পৃ. ৩৩।
১০. তদেব, পৃ. ৩৬।
১১. তদেব, পৃ. ৩৬।
১২. তদেব, পৃ. ৪৮।
১৩. তদেব, পৃ. ৪৯।
১৪. তদেব, পৃ. ৪৯।
১৫. তদেব, পৃ. ৪২।
১৬. তদেব, পৃ. ৫২।
১৭. তদেব, পৃ. ৫৫।
১৮. তদেব, পৃ. ৬১।
১৯. পম্পা মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনীতি, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ১৫১।
২০. মহাশ্বেতা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, একাদশ খণ্ড, মাস্টার সাব দ্রঃ, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২১, পৃ. ৬৩-৬৪।
২১. তদেব, পৃ. ৭৫-৭৬।

চঞ্চল মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাননগর মদনমোহন তর্কালংকার কলেজ
আসাননগর, নদিয়া

মুর্শিদাবাদ : ঐতিহাসিক জেলার অঐতিহাসিক জরি শিল্প

অলোককুমার বিশ্বাস

মুর্শিদাবাদ অর্থনীতি কৃষি-নির্ভর এক পশ্চাদপদ জেলা। কোন বৃহৎ কলকারখানা না থাকায় মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভর চাষ-বাসের উপর। যদিও বিগত সরকারের আমলে রেজিনগর সংলগ্ন অঞ্চলে শিল্প তালুক গড়ে উঠেছে। যদিও সেখানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং ক্রিয়াকলাপ আজও সেই ভাবে শুরু হয়নি। ফলে এ জেলার জনগণ বিকল্প কাজের জন্য মুখিয়ে থাকে। সেজন্য সামান্যতম হলেও গৃহভিত্তিক শিল্পের প্রসার। এই জেলার চিরাচরিত শিল্পগুলি একসময় সারা ভারতময় সুনাম অর্জন করেছিল। যেমন, খাগড়ার কাঁসা-শিল্প, জিয়াগঞ্জের বালুচরি শাড়ি এবং হাতির দাঁতের কাজ, শেরপুর, ইসলামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সিল্কের শাড়ি ও সুতির তৈরি পোশাক শিল্প, ডোমকল অঞ্চলের শাঁখা শিল্প। এইসব শিল্পগুলির কিছু আজও তাদের ক্ষীণ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। আর কিছু সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে।

একদিকে যেমন কিছু কুটির শিল্পের অবলুপ্তি ঘটেছে তেমনি করে আবার কিছু শিল্পের একদেশীভবন ঘটেছে। যারা যুগের চাহিদা অনুযায়ী তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চলছে। উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলি হল—পাটের সোনালী তন্তু বা আঁশ থেকে তৈরি বিভিন্ন রকম গৃহ শোভাবর্ধনকারী উপকরণ সামগ্রী। যে শিল্পের প্রতিষ্ঠাতাগণ রাষ্ট্রীয় স্তরে বিভিন্ন রকম পুরস্কারও পেয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই পাটতন্তু শিল্পের বর্ধনশীলতা এ জেলার এখন আর্থিক বিকাশের অংশ।

এমনি ভাবে এই জেলার নিজস্ব চিন্তাভাবনাপ্রসূত শিল্প বা কারিগরি দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ না হলেও অন্যের হাত ধরে জরি শিল্প প্রতিষ্ঠিত। তবুও যে প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়ায় সেটি হল, এ জেলার উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কাজের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক, সম্পূরক কি না? সেই জন্যই অন্য শিল্পের খোঁজে যেমন বাড়ির মহিলারা এগিয়ে এসেছেন তেমনি পুরুষেরাও কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। আজ গৃহনির্মাণ শিল্পে সারা ভারতে যে পরিমাণ শ্রমিক কাজ করে তার একটা বড় অংশ মুর্শিদাবাদ জেলার।

আর্থিক সমস্যার সমাধানে এখানকার মানুষ অন্যভাবে অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে নিচ্ছে। আর সেই নতুন শিল্পভাবনার মাধ্যম হল হস্তশিল্পের নতুন নতুন ভাবনা। মুর্শিদাবাদ জেলা রাজ্যের অন্যান্য জেলার চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। গত এক দশকে অবশ্য সেই অবস্থা থেকে অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়ে কুটির শিল্প একটা বিশেষ অবস্থা করে নিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার কুটির শিল্পের সাম্প্রতিক সংযোজন হল জরি শিল্প। জরি শিল্প বর্তমানে ভগবানগোলা-২ নং ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে, নওদা থানার কয়েকটি গ্রামে এবং বহরমপুর ব্লকের কয়েকটি গ্রামেও নিজেদের সম্প্রসারণ লক্ষণীয়।

আজ ভগবানগোলা-২ ব্লকের নসিপুর, হাসানপুর, খামাজদিয়ার, আঁখেরীগঞ্জ, যাজিরাচর, চরকুঠী বাড়ি, ডুমুরিয়া, মনসুরপুর, খরিবোনা, বালাগাছি, বীরপাড়া, কাতলামরি, শেখেরপাড়া গ্রামগুলিতে আজ ব্যাপকভাবে জরির কাজ চলছে।

বিশ্বাস, অলোক কুমার : মুর্শিদাবাদ ঃ ঐতিহাসিক জেলার অঐতিহাসিক জরি শিল্প
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 1, June 2020, Page : 32-36, ISSN 2249-4332

এইসব গ্রামে যিনি জরির কাজের প্রসার ঘটিয়েছেন তিনি হলেন মনিরা খাতুন (২৭) এবং তাঁর স্বামী রূপলাল শেখ (৩১)। আজ থেকে ১০ বছর আগে অর্থাৎ ২০০১ সাল নাগাদ তারা এই কাজ প্রথম শুরু করেন মুর্শিদাবাদের নসিপুর গ্রামে।

আজ ইতিহাসের আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে। শুধুমাত্র শাসকের কাহিনী বর্ণিত নয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ 'তলার থেকে ইতিহাস' লেখার প্রয়োজনীয়তা এবং সমধিক গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টিকে দেখতে গিয়ে, সাধারণ জনগণের জীবন-জীবিকার বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের 'জরি শিল্প' নিয়ে লেখার প্রয়াস।

এই গল্পের (ইতিহাসের) প্রেক্ষাপটে মনিরা খাতুন এবং তাঁর স্বামী রূপলাল শেখ জন্ম দিয়েছে ছোট্ট একটুকরো ইতিহাস। মনিরা খাতুনের বাপের বাড়ি হাওড়া জেলার রানিহাটিতে। মুর্শিদাবাদের অন্যান্য পুরুষের মত গৃহনির্মাণ শিল্পে কাজের জন্য রূপলাল হাওড়া জেলার রানিহাটিতে মনিরা খাতুনের পাড়াতেই ভাড়া থাকতেন এবং কাজ করতেন। এখানে থাকতেই মনিরা খাতুন এবং রূপলালের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক এবং পরিণতি, বৈবাহিক সম্পর্ক। রূপলালের সঙ্গে মনিরা খাতুন নসিপুর গ্রামে আসে। মনিরা বাপের বাড়িতে জরির কাজের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছিল। নসিপুর গ্রামে এসে সাংসারিক কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ না থাকায় তারা সিদ্ধান্ত নেন, নিজের বাড়িতে জরি শিল্পের কাজ করবেন। রূপলাল সম্মতি দেন এবং হাওড়া জেলার রানিহাটি থেকেই মনিরার জন্য এই কাজের সব ধরনের উপকরণ এনে দেয় এবং উৎপাদন শুরু হয়।

আজ ভগবানগোলা-২ ব্লকের প্রায় ১৫ থেকে ২০ টি গ্রামে জরির কাজের সূত্রপাতের কর্ণধার মনিরা খাতুন এবং তাঁর স্বামী রূপলাল শেখ। বর্তমানে প্রায় ভগবানগোলা-২ ব্লকের প্রায় ২ হাজার ৩ হাজার পরিবারের মেয়েরা, বাড়ির গৃহিণীরা এই কাজ করে তাদের রোজগার করতে সমর্থ হয়েছে। নসিপুর গ্রামের মেয়ে রজিনা খাতুনের বক্তব্য, মনিরা (ভাবি) খাতুন এই জরির কাজ এনে আমাদের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে। আমার দিদিও এই কাজ করত। দিদি এই কাজ করে অনেক পয়সা রোজগার করেছিল, তার বিয়ের সময় আব্বা দিদির থেকে ঐ টাকা নিয়ে তার বিয়ে দেয়। দিদির বিয়ে হয়েছে খরিবোনা, সে এখন শ্বশুর বাড়িতে গিয়েও জরির কাজ করে। তাই আমরা মনিরা খাতুনকে কাজ শিখিয়ে জরির কাজ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

প্রথম এই শিল্প এখানে শুরু করেন মনিরা খাতুন। তাঁর বক্তব্য—এই কাজ করে অনেক পরিবারের মেয়েদের বিয়ের খরচ তারা নিজেরাই জোগাড় করতে সমর্থ হয়েছে। এখানে বিয়ে হয়ে আসার পর দেখি এখানকার মেয়েদের সংসারের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। সংসারের কাজের পর এরা বসে থাকে। প্রথমে আমি এখানকার অবিবাহিত মেয়েদের এই কাজ শেখার ব্যবস্থা করি। তারা শিখতে লাগল, তারপর এলো ঘরের বউরা। প্রথম যখন আমি এই কাজ শুরু করি তখন আমার এই ঘরে একসঙ্গে প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ জন মেয়ে এসে কাজ দেখত এবং শেখার চেষ্টা করত। আমি তাদেরকে জরির কাজ শিখিয়ে তাদের বাড়িতে কাজের উপকরণ জোগাড় করে দিয়ে তাদেরকে দিয়ে উৎপাদন করাতাম। এখন অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আমার কাছ থেকে কাজ শিখে কয়েকজন নিজেরাই এখন মহাজন হয়ে গিয়েছে। তারা কোলকাতা থেকে শাড়ি, জরির কাজ করার মালপত্র এনে কারিগর খাটিয়ে আমার থেকে বেশি টাকা রোজগার করছে। বর্তমানে আমরা প্রতিমাসে ১৫০ টি থেকে ২০০ টি শাড়ির কাজ এখানকার কারিগর দ্বারা করিয়ে থাকি।

জরি শিল্প কাজের বিষয়টি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। জরির কাজ করার জন্য শিল্পী শাড়িটিকে দুটি কাঠের মাঝে টান টান করে বাঁধা হয়। দুটি ছয় ফুট লম্বা কাঠের মাঝে ছয় ইঞ্চি দূরত্বে ফুটো করা থাকে। ঐ ফুটোর মধ্য দিয়ে সুতলি বা নাইলনের পাকানো মোটা সুতো পরানো থাকে। চার ফুট লম্বা দুটো কাঠের বাতা দ্বারা আটকানো থাকে। বাতাতে এক ইঞ্চি দূরত্বে ফুটো থাকে। এরপর শাড়িটিকে দুই প্রান্তে আড়াআড়ি ভাবে চারফুট লম্বা ফুটো করা দুটো বাতার গায়ে প্রয়োজন মতো দূরত্বে পেরেক গেঁথে শাড়িটাকে টানটান করা হয়। এরপর আড়ি সূচ ও ল্যাদা সূচ এবং দেশি হাত সূচের মাধ্যমে সুতোর সাহায্যে নকশা অনুযায়ী চুমকিগুলিকে বসানো হয়।

চুমকির স্থায়ীত্ব সবসময় তার নির্ভর করে কারিগরের দক্ষতার উপর। কারিগর শাড়ির উপর আঠা দিয়ে তার উপর চুমকি এঁটে দেয়। এক্ষেত্রে চুমকি কিভাবে, কোথায়, কোন ধরনের রঙের, কত বড় আয়তনের, শাড়ির উপর লাগানো হবে সেটা নির্ভর করে মালিক কোন ধরনের শাড়ির ডিজাইনের অর্ডার দিয়েছে তার উপর নির্ভর করে। চুমকি লাগানোর আঁঠা এতো দৃঢ় বন্ধন যুক্ত হয় যে শাড়িকে পরবর্তীতে সাবান বা সার্ফ জলে ধুলেও তা ওঠে না বা নষ্ট হয়ে যায় না।

চুমকি বসানো শাড়ি বলতেই সিন্থেটিক শাড়ি। যে শাড়িগুলিতে চুমকির কাজ করা হয় সে শাড়ির নাম হল রেশম, ক্রেপ, সিফন, জর্জেট এবং রসগোল্লা। রসগোল্লা শাড়ি ক্রেপ শাড়ি থেকে অনেকটা সফট এবং সুন্দর ও তুলনামূলক দামি এই শাড়ি মুর্শিদাবাদ রেশম শাড়ির মত বলে মনিরা মনে করেন। তবে রেশম শাড়ি নয়। এই শাড়ি সিন্থেটিকের হলেও গুণগতমানসম্পন্ন। জর্জেট শাড়ির দাম তুলনামূলক অনেকটা কম। জর্জেটের শাড়িতে যে জরির কাজ করা হয় তা খুব বেশি দামি তেমন নয়।

শিল্পে ব্যবহৃত উপাদানগুলি—কারদান, রেশম সুতো, কসব দিয়ে এ্যাম্বোডায়ারিং, আঁড়ি সূচ, ল্যাথ সূচ, হাত সূচ, বিভিন্ন ধরনের কারদান, কাঠের বড় ফ্রেম, আর এই ফ্রেম বসানোর জন্য বাড়িতে থাকতে হবে একটু বেশি পরিমাণ ছায়াযুক্ত রোদ, জলমুক্ত জায়গা। বিভিন্ন ডিজাইনের ট্রেসিং পেপার, সাদা পাউডার বা দন্ত মাজন।

কারিগর শাড়ির উপর যে সব ডিজাইন তৈরি করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—ঝাড়ি ফুল, তিন পাত্তা, কেরী ফুল, বুটি ফুল, আরো কত রকমের ফুল এবং পাতা। এইসব ডিজাইনগুলো বেশির ভাগ শাড়ির আঁচলের দিকে বেশি থাকে। শাড়ির অন্য সব জায়গাগুলিতেও কম-বেশি থাকে। তবে দামী শাড়িতে গোটা শাড়ি জুড়ে জরির কাজ করা হয়। একটা শাড়িতে কতটা কাজ হবে তা নির্ভর করে মালিকের উপর। কারণ মালিক বাজারের চাহিদামত বিভিন্ন রকম শাড়ি তৈরি করে নেয়। কারিগর শুধুমাত্র জরির কাজ করেন।

এই কাজ বছরের সব সময়েই হয় তবে বেশি হয় বর্ষার সময়। কারণ বর্ষার পর বিভিন্ন পূজা পার্বণ শুরু হয়। শুরু হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ঘনঘটা।

ক্রেপ শাড়িতে কেরী ফুল দিয়ে কাজের মূল্য শ্রমিকরা পায় ২০০ টাকা। মালিক পায় ৩২০ টাকা, এখানে মালিক ক্রেপ শাড়ির জন্য আয় করে ১২০ টাকা। একটি রসগোল্লা শাড়িতে সাধারণ মানের জরির কাজ করে কারিগর পায় ৫০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা। এছাড়া সিফন শাড়ির কাজ করে একজন কারিগর পায় ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা। তবে কারিগরের মজুরী নির্ভর করে কারিগরের দ্বারা তৈরি শাড়িতে কি পরিমাণ জরির কাজ আছে তার উপর। নসিপুরের মনিরা বিবি যেমন একদিকে মহাজন অন্যদিকে তিনি সবথেকে ভালো কারিগরও। মনিরা বিবি সবথেকে বেশি জরির কাজের শাড়ির কাজ করেন। তিনি একটি শাড়িতে জরির কাজ করে ৬০০০ টাকা থেকে ৭০০০ টাকা পান। এই রকম

শাড়ি তৈরি করতে মনিরা বিবির সময় লাগে ১৫ দিন থেকে ২০ দিন। তিনি কখনো তাঁর বিশ্বস্ত কারিগরকে দিয়েও তুলনামূলক বেশি দামি শাড়ি তৈরি করেন। এখন এই অঞ্চলগুলিতে শুধুমাত্র জরির শাড়ির কাজ হয়।

একসময় এখানে প্রচুর পরিমাণে ব্লাউজের (গলাতে) উপর জরির কাজ হত। নসিপুরের শাকিনা বিবি ব্লাউজের ভারো কারিগর। তিনি বলেন, জরি দেওয়া শাড়ির থেকে ব্লাউজের কাজ করে বেশি পয়সা পাওয়া যেত। কিন্তু সবসময় এই কাজ হয় না, এখন এই কাজ বন্ধ আছে।

মুর্শিদাবাদ জেলাতে যে ভাবে বিড়ি শিল্পের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে তার মধ্যে একটা কারণ হল, এ জেলার স্বল্প মূল্যের অধিক মহিলা ও শিশু শ্রমিক। এই জরি শিল্পের কারিগরগণও হল মহিলা। মহিলারা সংসারের কাজ সম্পন্ন করার পর অবসর সময়ে তারা এই কাজ করে থাকে। অবশ্য শুধুমাত্র যে অবসর বিনোদনের জন্য বা শুধুমাত্র সংসারের কাজের ফাঁকে এই কাজ করে তা নয়। কারো কারো জীবন জীবিকাও এই জরি শিল্পের উপর নির্ভরশীল। জরি শিল্প বেশির ভাগ মহাজনকেন্দ্রিক ব্যবসা। মহাজনের এই শিল্পের উপকরণ যেমন, শাড়ি, চুমকি ও সুতো কারিগরদের সরবরাহ করে থাকে। যার ফলে গ্রামে বসে কারিগররা মহাজনদের মাধ্যমে জরি শিল্পের উপকরণ পেয়ে থাকে এবং তারা তাদের কাজ করে। এখানে কারিগরকে শাড়ি বা চুমকি কেনার জন্য কোন রকম অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় না। উৎপাদিত পণ্যের কোন রকম মার্কেটিং করতে হয় না। এমনকি জরির কাজ শেষের পর জরি শিল্পের শ্রমিককে কাপড় মালিকের ঘরে পৌঁছে দিতে হয় না। মালিক জরি শিল্পীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে নেয়। অর্থাৎ সব দায়িত্ব মহাজনের। অবশ্য যারা ব্যক্তি মালিকানাধীন কাজ করে তাদের ব্যাপার একটু আলাদা। তাদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য শাড়ি ক্রয় করা, জরি ক্রয় করা, সুতো ক্রয় করা—এসব কাজ করতে হয়। সেই সঙ্গে তাদের বাজারের চাহিদামত পণ্য তৈরি করতে হয়। উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রিও করতে হয়। হয়তো জরি শিল্পী শ্রমিকের কাজ করলে মালিক তাদের সঠিক পারিশ্রমিক দেয় না। কিন্তু ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত জরি মালিকগণ তুলনামূলক কিছু পয়সা বেশি পায়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিককে বেশি ঝুঁকিও নিতে হয়। তাই বেশির ভাগ জরি শিল্পী মালিকের কাজ করতেই পছন্দ করে।

জরি শিল্পের কাজ করার জন্য যে সব উপকরণের প্রয়োজন হয়—শাড়ি, চুমকি, কিরকিরি, কাঠদান, থালা চুমকি, পাথর এছাড়া কাজ করার জন্য আরি, সূচ, কাঁচি, সুতো, বেশ কয়েক টুকরো কাঠ এবং বাঁশ। শাড়ির উপর নকশা করার জন্য দুটো ছয় ফুট লম্বা বাঁশ, দুটো চার ফুট লম্বা ব্যাতা ইত্যাদি। শাড়িতে নকশা তৈরির জন্য লম্বা বাঁশ এবং কাঠ বিশেষ প্রয়োজন। জরির কাজের জন্য মহাজনেরাই নিজেরাই শাড়ির উপর নকশা এঁকে কারিগরদের হাতে পৌঁছে দেয়। কিছু কিছু কারিগর অবশ্য তাদের নিজেদের মত করে নিজেরাই নকশা আঁকিয়ে নেয়। শাড়িতে জরির জন্য যে নকশা প্রয়োজন তারও একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। যেমন শাড়িতে নকশা বানানোর জন্য বিশেষ কাজ করা ট্রেসিং পেপারের ব্যবহার করা হয়। নকশা করা ট্রেসিং পেপারগুলিকে প্রয়োজন মতো শাড়ির উপর রেখে তার উপর বরিক পুডার মাজন কেরোসিন মিশিয়ে একটি পেষ্ট তৈরি করা হয়। তারপরে ঐ পেষ্টটিকে ট্রেসিং পেপারের উপর বুলিয়ে নকশা গুলোকে কাপড়ের উপর তোলা হয়। তারপর কাপড়ের উপর নকশাগুলি স্পষ্ট করে শুকিয়ে নিয়ে নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন রকম চিত্র অঙ্কন করা হয়। শিল্পীর বিশেষ দক্ষতা এক্ষেত্রে বেশি প্রয়োজন হয় না। তবে শিল্পীকে অবশ্যই সূচি শিল্পকাজে দক্ষ হতে হয়।

কোন শিল্পের গতি প্রকৃতি নির্ভর করে কোন জেলার অর্থনৈতিক চরিত্রের উপর, শ্রমিকের প্রাচুর্যের উপর। এছাড়াও

আরো অনেক কারণ আছে। মুর্শিদাবাদের মতো অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া একটি জেলার জরি শিল্প খুব সম্ভাবনার দাবি রাখে। কারণ জরি শিল্পের সামান্যতম প্রশিক্ষণ দিয়ে মেয়েদের এই কাজে লাগাতে পারলে একদিকে যেমন জরি শিল্পের প্রসার ঘটবে তেমনি অর্থনৈতিক দিক থেকেও কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী বানানো সম্ভব। একটা দিকে বিশেষ কিছুটা হলেও সুবিধা হত যে, এ জেলাতে যেভাবে অস্বাস্থ্যকর বিড়ি শিল্পের প্রসার ও তাতে মেয়েদের এবং শিশুদের অংশগ্রহণ তা কিছুটা কমতো। এই শিল্পে কারিগরদের কোনরূপ অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় না। উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য বাজারের কোন খোঁজ করতে হয় না। শুধু ঘরে বসে সংসারের কাজ করার পর অবসর সময়ে সুবিধা মত জরির কাজ করলেই হয়।

অসুবিধা হল এই কাজ সম্পূর্ণ মহাজননির্ভর একটি শিল্প। মহাজনেরা ভেতরের গ্রামের শিল্পীদের দিয়েও বিশেষ কাজ করাতে চায় না। কারণ তাহলে মহাজনকে উৎপাদিত পণ্যের জন্য কাঁচামাল পৌঁছে দেওয়া এবং উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করতে খরচ বেশি হবে। তাছাড়া মহাজনেরা তাদের সুবিধামত জায়গাগুলিতে যদি তাদের কাজের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে তবে কেন সুদূর প্রান্তরের গ্রামে যাবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে মেয়েরা জরি কাজের প্রশিক্ষণ নিয়েও কাজ পাচ্ছেন না। আবার ব্যক্তিগত উদ্যোগেও কারখানা তৈরি করে কাজ করতে পারছেন না। খুব সামান্য কিছু লোক নিজেদের উদ্যোগে জরির কাজ করে থাকে।

সাক্ষাৎকার - মনিরা খাতুন, নসিপুর, ভগবানগোলা-২ ব্লক, মুর্শিদাবাদ, ১০.০৩.২০১৭

অলোককুমার বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
মধ্যমগ্রাম বিবেকানন্দ কলেজ, কলকাতা

প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন : প্রেক্ষাপট আন্দামান

সৌমেন মুখোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করলেন প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪) তাঁর আন্দামানকেন্দ্রিক উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। আন্দামান যে উপন্যাসের বর্ণিতব্য বিষয় হতে পারে তা আমাদের বৌদ্ধিক জগতে প্রথম নিয়ে এলেন ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায়। বলা যেতে পারে বাংলা উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিসীমাকে তিনি অনেকাংশে বিস্তৃত করেছেন। কখনো নাগাল্যান্ড, কখনো বিহার, কখনো মুম্বাই, কখনো সুন্দরবন আবার কখনো আন্দামান—তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসগুলি প্রকৃত অর্থেই আমাদের কাছে যেন ভারতজোড়া কথনকথা হয়ে উঠেছে। আসলে ব্যক্তিগত জীবনে কাজের প্রয়োজনে এবং লেখার রসদ সংগ্রহের তাগিদে তাঁকে সারা ভারত ভ্রমণ করতে হয়েছে। ফলত তাঁর উপন্যাসে ভারতের নানা অঞ্চল উঠে এসেছে পটভূমি হিসাবে। সেই রকমই আন্দামানও তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত প্রফুল্ল রায় আন্দামানকে কেন উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে বেছে নিলেন তার একটা কারণ আছে। প্রফুল্ল রায় নিজেই সেকথা বারবার জানিয়েছেন। উনিশশ সাতচল্লিশের দেশভাগের কিঞ্চিৎ আগে এবং পরবর্তী কালে হাজার হাজার, লক্ষ-লক্ষ মানুষ অত্যাচারিত, নিপীড়িত, ধর্ষিত হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে পূর্বপাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। মারা গিয়েছিল কত মানুষ তার ঠিক ঠিকানা নেই। এপার বাংলায় এসে সেই গৃহহারা, ছন্নছাড়া, উদভ্রান্ত উদ্বাস্তু মানুষগুলো যেন দিশাহারা হয়ে পড়ল। শিয়ালদা, বাঘাযতীন, গড়িয়া, মানিকতলা, শ্যামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে রাস্তায়, নর্দমার ধারে, পরিত্যক্ত জায়গায়, প্লাটফর্মে কোনো রকমে তারা বসবাস করতে লাগল। খাদ্য নেই, জল নেই, বস্ত্র নেই—সব মিলিয়ে কলকাতা তখন এক নরককুণ্ড। লেখক নিজেও তাদেরই একজন প্রতিনিধি। তাই তিনি অন্তর থেকে তাদের প্রতি একটা মায়া, মমতা অনুভব করেন। ভারত সরকার, তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুঝেই উঠতে পারছিল না এই এত মানুষের চাপ কিভাবে সামলানো যাবে। প্রাথমিকভাবে অনেকগুলি রিফিউজি ক্যাম্প এবং কিছু সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হলেও তা যথেষ্ট ছিল না। সেই সময় ঠিক হয় দণ্ডকারণ্য, আন্দামান প্রভৃতি জায়গায় নতুন করে রিফিউজিদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। সেই মত রিফিউজি ক্যাম্প থেকে ইচ্ছুক মানুষদের নিয়ে যাওয়া হত আন্দামানে। উদ্বাস্তুরা কিভাবে আবার নতুন করে জীবন শুরু করবে, সত্যিই আন্দামানে তারা মানিয়ে নিতে পারবে কিনা? তাদের হারিয়ে যাওয়া মাটি আবার ফিরে পাবে কিনা তা জানার একান্ত ইচ্ছা ছিল লেখক প্রফুল্ল রায়ের। তিনি কল্যাণ মৈত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন—

> 'আমি মনে করি, আমি নিজে একজন উদ্বাস্তু। আ ডিসপ্লেসড পারসন। ছিন্নমূল মানুষ তাদের স্বভূমি ছেড়ে সমুদ্র পার হয়ে সুদূর অজানা অচেনা দ্বীপপুঞ্জে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে—কীভাবে আবার তারা মেনস্ট্রিমে ফিরে আসবে, নতুন সমাজ গড়বে, মাথা তুলে দাঁড়াবে—সেটাই আমার অন্বেষণের বিষয় ছিল।... যেখানেই ছিন্নমূল মানুষ, উদ্বাস্তু—আমি ছুটে গিয়েছি।'[১]

দেশভাগ পরবর্তীতে লেখা দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা বিষয়ক উপন্যাসে আমরা সাধারণত কতকগুলি বিষয় লক্ষ করি। সেগুলি হল— দেশভাগের মর্মান্তিক চিত্র, ওপার বাংলার সুখ সমৃদ্ধি ছেড়ে, নিঃস্ব রিক্ত ধর্ষিত হয়ে এপার বাংলায় আসা। তারপর শরণার্থী শিবির, প্লাটফর্ম-যত্রতত্র তাদের বেঁচে থাকার নরকযন্ত্রণা। ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত জায়গায়, ফেলে যাওয়া মিলিটারি ব্যারাকে, জলাভূমির উপর জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে। একই সঙ্গে এই সব জমির মালিক এবং তাদের লেঠেল বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে, হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে সংগ্রাম করে, তারা কীভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখল—

মুখোপাধ্যায়, সৌমেন : প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ঃ প্রেক্ষাপট আন্দামান
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 1, June 2020, Page : 37-45, ISSN 2249-4332

সেই বেঁচে থাকার কাহিনি পাই। প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে এর পাশাপাশি আমরা পেলাম এই উদ্বাস্তুদের অজানা দ্বীপে বেঁচে থাকার লড়াই সংগ্রাম। মানুষগুলো দেশভাগের ঘৃণ্য চক্রান্তে একবার তো স্বজনহারা, বাস্তুহারা, দেশছাড়া হলই, পাশাপাশি তাদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অজানা রহস্যের দ্বীপে। পশ্চিম বাংলার নানা স্থানে, যত্রতত্র থাকলেও তবু তারা থিতু হতে চাইছিল। কিন্তু আন্দামানে যাওয়ার খাতায় নাম লিখিয়ে দেবার পর তারা যেন দ্বিতীয় বার উদ্বাস্তু হতে চলল। মূল ভূখণ্ড ছেড়ে অনন্ত অসীম বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে আন্দামান দ্বীপ। সেখানে কি আছে, মানুষ থাকে কি না— এই ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন মানুষগুলোর মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেমন ভয় খায়, তেমনি অসংখ্য গৃহহীন মানুষ তাদের অধিকার করে থাকা পাঁচ হাত জায়গাটা ছেড়ে যেতেও ভয় পায়। তবুও তো আশায় মরে চাষা। এই আশায়, বিশ্বাসে এবং অতিরঞ্জিত করে বলা কিছু লোভের বশবর্তী হয়ে তারা চলেছে আন্দামানে। নতুন কলোনি বসানোর ঐকান্তিক বাসনায়।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থী সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকায় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় কিছু শরণার্থী যারা ইচ্ছুক তাদের আন্দামানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। সেই মত আন্দামানে জঙ্গল কেটে বসবাসের উপযোগী জায়গা তৈরি করা হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী ক্যাম্পগুলো থেকে উদ্বাস্তুদের তালিকা তৈরি করে তাদের আন্দামানে পুনর্বাসনের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রফুল্ল রায়ের 'নোনা জল মিঠে মাটি' (১৯৮৩), 'শতধারায় বয়ে যায়' (২০০৮), 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা' (২০০৯) উপন্যাসে উদ্বাস্তুদের আন্দামানে পুনর্বাসনের একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র আছে। শুধু তাই নয় আন্দামানে গিয়ে সেই সমস্ত গৃহহারা ছন্নছাড়া মানুষগুলো কিভাবে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে তারও একটা বাস্তবসম্মত চিত্র আমরা প্রফুল্ল রায়ের বেশ কিছু উপন্যাসে পেয়ে যাই। 'শতধারায় বয়ে যায়' উপন্যাসে দেখি বিনয় সংবাদপত্রের প্রয়োজেনে, আন্দামানের উদ্বাস্তু পুনর্বসনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য আন্দামানে যাচ্ছেন। কারণ আন্দামানে পুনর্বাসনের বিষয়ে উদ্বাস্তুদের মনে অনেক অজানা আশঙ্কা ছিল। বিশেষ করে পলিটিক্যাল পার্টির নেতারা উল্টো পাল্টা প্রচার চালিয়ে তাদের মনে বিভ্রান্তি তৈরি করছিল। তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য এবং সেখানে উদ্বাস্তু মানুষগুলোকে সরকার কিভাবে পুনর্বাসন দেবে তা দেশের সাধারণ মানুষের জানা একান্ত প্রয়োজন। সেই বিষয়ে সংবাদপত্রের ভূমিকা যেহেতু অনেকখানি তাই সাংবাদিকদের সেখানে যাওয়া এবং সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী প্রতিবেদন রচনা করার প্রয়োজন ছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রফুল্ল রায় নিজেও উদ্বাস্তু ছিলেন বলে তিনি আন্দামানে পুনর্বাসনের বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ অনুভব করেন এবং দীর্ঘ ন'মাস তিনি সেখানে ছিলেন। উদ্বাস্তুদের কলোনি নির্মাণের চিত্র তাই নিজে চোখে দেখেছেন তিনি। ফলে তাঁর বর্ণনা বাস্তবসম্মত এবং তথ্যনিষ্ঠ হয়েছে। আন্দামানে উদ্বাস্তুদের নিয়ে যাবার পূর্বে বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে শরণার্থীদের নামের তালিকা তৈরির সময় কত রকমের অসুবিধা এবং প্রলোভনের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল তার একটা পরিচয় আমরা এই উপন্যাসে পাই। রিফিউজি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টে কর্মরত নিরঞ্জন চক্রবর্তী, বিভাস সাহা এবং হিরন্ময় চৌধুরী, পরিতোষ পালিত ও প্রিয়নাথ গুপ্ত এই তিনজন উক্ত বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে বিনয় গিয়ে হাজির একটা বড় মাঠে। সেখানে দমদমের চারখানা রিফিউজি ক্যাম্পের লোকেদের আনা হয়েছে। হিরন্ময় মাঠ ভর্তি রিফিউজিদের বলেছে—

> 'দেশভাগের ফলে আপনাদের সর্বস্ব গেছে। ইন্ডিয়ায় এসে কি কষ্ট করে ক্যাম্পে দিন কাটাচ্ছেন, প্রতি মুহূর্তে সেটা বুঝতে পারছেন। কিন্তু সারা জীবন এভাবে চলতে পারে না। আপনাদের ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। পশ্চিম বাংলায় জায়গা জমির খুবই অভাব। তাই সরকার ঠিক করেছে আপনাদের আন্দামানে পাঠাবে। সেখানে প্রতিটি পরিবারকে দেওয়া হবে একুশ বিঘে করে চাষের জমি। বাড়ি করার জন্য আরো কিছু জায়গা। স্কুল, হাসপাতাল, পোস্ট অফিস—সব তৈরি হচ্ছে।...[২]

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভ্রান্ত উদ্বাস্তুদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় না। তারা প্রতিবাদ করে বলে—

> ''আপনাগো কুনো কথা হুনুম না। আমরা জানি রিফুজগো জাহাজে ভইরা লইয়া গিয়া মইদ্য সমুন্দরে

ফালাইয়া দ্যায়। হাঙ্গরে, কুমৈরে (কুমিরে) হেগো খাইয়া শ্যাষ করে।''[৩]

ছিন্নমূল মানুষগুলো যে আন্দামানের পুনর্বাসনের বিষয়ে যথেষ্টই বিভ্রান্ত এবং তাদেরকে যে মিথ্যা ভয় দেখানো হয়েছে তা বোঝাই যায়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির কিছু ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল তা মনে করা যেতে পারে। শুধু তাই নয় আন্দামানে গেলে যে তাদের সাপের মুখে বা বাঘ-ভাল্লুকের পেটে পড়ে শেষ হয়ে যেতে হবে একথাও এক বৃদ্ধকে বলতে শুনি। অন্যদিকে নিরঞ্জনও জোর গলায় বলতে থাকে যে তাদের কথা ঠিক নয়, বরং উল্টো। সে বলে—

> ''আন্দামানে সাপও নাই বাঘও নাই। আছে পালে পালে হরিণ। আর ওইহানের সমুন্দরে কত যে মাছ তার ল্যাখ্যাজোখা নাই। জঙ্গলে ঢুকলেই হরিণ পাইবেন। জালের একখান খ্যাও (খেপ) দিলে সমুন্দর থিকা দশ স্যার পনরো স্যার কইরা মাছ উঠব। প্যাট ভইরা যত ইচ্ছা মাছ, যত ইচ্ছা মাংস খাইতে পাইবেন।''[৪]

অর্থাৎ মিথ্যাচারের কৌশলের বিরুদ্ধে পাল্টা মিথ্যাচার চলতে থাকে এই শরণার্থী অসহায় ছিন্নমূল মানুষগুলোকে নিয়ে। শুধু তাই নয় মিথ্যার পর্দা আর একটু তুলে বিভাস সাহা তাদের বলতে থাকে—

> ''আরও একহান জবর খবর দেই। আন্দামানের জঙ্গলে শ'য়ে শ'য়ে গাছে আপেল, আঙুর ফইলা রইছে। পইড়া পইড়া পচতে আছে। যাইবেন, পাড়বেন আর খাইবেন।''[৫]

এখানেই শেষ নয়। বিভাস সুর আরো চড়িয়ে মিথ্যাচারের অবশিষ্টাংশটাও অনায়াসেই বলে চলে—

> 'বুঝতে পারি জাহাজে উঠতে হইব বইলা আপনেরা ডরাইয়া গ্যাছেন। কুনো চিন্তা নাই। মোটে একহান রাইত। ডায়মন্ডহারবার পার হইলেই দ্যাখবেন চর পড়ছে। হেই হানে আপনেগো নামাইয়া দিমু। হাইটা হাইটা (হেঁটে হেঁটে) আন্দামান চইলা যাইবেন।''[৬]

মিথ্যাচার থাকলেও নিরঞ্জন বা বিভাসরা জানত যে পরিমাণ মানুষের স্রোত এসেছে বা আসছে তাতে করে পশ্চিমবাংলায় স্থান সংকুলান যেমন হবে না তেমনি অর্থনৈতিক চাপও বাড়বে। তাছাড়া আন্দামানের মাটি অত্যন্ত উর্বর, মাছও সেখানে পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। আবার আবহাওয়ার দিক বিচার করলে পূর্ব বাংলার থেকে খুব বেশি পার্থক্য নেই আন্দামানে। তাই উদ্বাস্তুরা যদি আন্দামানে যায় তাহলে তারা যে পরিমাণ চাষের জমি এবং বসত বাড়ি তৈরির জন্য যা জমি ও সাহায্য পাবে তাতে করে মানুষগুলো এই নরককুণ্ড থেকে বেঁচে যাবে। আরো একটা বিষয়—যত বেশি বাঙালি শরণার্থী যাবে আন্দামানে ততই আন্দামান দ্বিতীয় বাংলা হয়ে উঠতে পারবে তাড়াতাড়ি। আবেগের সুরে প্রসাদ লাহিড়িকে নিরঞ্জন বলেছে—

> '...আন্দামানের জমি হাই ক্লাস। ভেরি ফার্টাইল ল্যান্ড। ইস্ট পাকিস্তানের রিফিউজি যারা দ্যাশে চাষবাষ লইয়া আছিল, হেগো যদি হেইখানে লইয়া যাওয়া যায়, সোনা ফলাইয়া দিতে পারব। তার উপুর বে অফ বেঙ্গলে কত যে মাছ তার লিখাজোখা নাই। সাত জন্ম খাইলেও ফুরাইব না। রিহ্যাবিলিটেশন যদি সত্যিই হয়, সুযুগটা ছাড়ন ঠিক অইব না। আন্দামান সেকেন্ড ব্যাঙ্গল অইয়া উঠব। ওয়েস্ট ব্যাঙ্গলের উপুর চাপ অনেক কইমা যাইব।''[৭]

খিদিরপুর ডক থেকে সমস্ত রকম মেডিকেল চেক আপ করে একটা করে ইনজেক্শন দিয়ে দেওয়া হত উদ্বাস্তুদের। তারপর জাহাজে করে নিয়ে আসা হত আন্দামানে। নতুন কলোনি নির্মাণের জন্য একরাশ আশঙ্কা আর আর অনেক আশা বুকে নিয়ে উদ্বাস্তু মানুষগুলো দ্বিতীয় বারের জন্য উদ্বাস্তু হয়ে ভেসে পড়ত অকূল সমুদ্রে।

জীবননাট্যের রঙ্গমঞ্চে উদ্বাস্তু মানুষগুলোর জীবনে তৃতীয় পর্বের পালা শুরু হল। প্রথমে অখণ্ড বাংলা, তারপর উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলোনিতে দিন যাপন এবং তৃতীয় পর্বে আন্দামানে পুনর্বাসন। সমুদ্রের ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে তারা আন্দামানে এসে পৌঁছেছে। আন্দামানের মাটিতে নেমে মানুষগুলো যেন ভয়ে, আতঙ্কে কুঁকড়ে যেতে থাকে। একরাশ ভয় বুকে নিয়ে, অসীম অনন্ত জিজ্ঞাসা চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলে চুপচাপ বসে থাকে ভীরু, নিঃস্ব, অসহায়

মৃত্যুমুখ উদ্বাস্তু মানুষগুলো। তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

> 'উপসাগরের পারে ম্যানগ্রোভ বনের নীচে ডেলা পাকিয়ে বসল তারা। ভীত চোখে বন, সমুদ্র আর দ্বীপ দেখতে লাগল।''[৮]

বাঁচার আর কোনো উপায় নেই দেখে মানুষগুলো এই দ্বীপেই নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। যে কঠিন লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এতদিন তারা বেঁচে ছিল, আজও এই নির্জন দ্বীপে নতুন করে বাঁচার জন্য তারা মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে থাকে। সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে পদ্মা-মেঘনার কথা তাদের মনে পড়ে। জলে অসংখ্য মাছ দেখে তারা আত্মহারা হয়ে যায়। আস্তে আস্তে তারা মনের মধ্যে সাহস পেতে থাকে। তাদের মনে হয়—

> 'কেম্প (ক্যাম্প) থিকা যহন আমাগো খিদিরপুরে লইয়া আইল, ডরে হাত-পাও প্যাটের ভিত্‌রে হাইন্দা (ঢুকে) গ্যাছিল। অহন মনে লয় (হয়) আন্ধারমানে না খাইয়া মরুম না। আর কিছু না জুটুক, সমুন্দুরে মাছ তো আছে। হেই খাইয়া বাইচা থাকুম।''[৯]

ধীরে ধীরে এই মৃত্যুপথযাত্রী মানুষগুলো পায়ের তলায় মাটি পেয়ে ধাতস্থ হতে থাকে। যে ভয়ঙ্কর অতীত তারা ফেলে এসেছে, যে ঝড় তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে সেই সব দিনগুলোর কথা ভাবতে থাকে আর মনে মনে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। বুড়িবাসিনী বুকে শ্বাস নিয়ে বলতে থাকে—

> 'পারকূল যহন পাইছি, মাটি যহন মিলছে, তহন আমরা বাচুম। ... আমরা বাচুম, নিশ্চয় বাচুম।''[১০]

যে বিষাক্ত রাজনীতির শিকার হয়ে একদিন তারা পায়ের তলা থেকে মাটি হারিয়েছিল সেই মাটিই আজ যেন তারা আবার ফিরে পেয়েছে। এই মাটিই তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসে দেখি হারান দ্বীপের চারিদিক ঘুরে এসে সবাইকে বলেছে বড় বাহারের জায়গা এই দ্বীপ। এখানে প্রচুর মাছ আছে যা সারা জীবনেও খেয়ে শেষ করা যাবে না। একদলা মাটিও সে হাতে করে নিয়ে এসেছে। বলেছে এই মাটিতে সোনা ফলবে। বয়স্ক রসিক শীলও সেই মাটি পরীক্ষা করে বলেছে—

> 'বড় বাহারের মাটি। ঠিকই কইছস হারাইন্যা, এই মাটিতে সোনা ফলব।''[১১]

চারিদিকের জঙ্গল কেটে ফাঁকা জায়গা তৈরি করে বাস্তুহারা মানুষগুলোর পরিবার পিছু দশ একর জমি বন্টন করা হয়েছিল। সরকার থেকে বড় বড় গাছ এবং মাঝারি মাপের গাছ কেটে দেওয়া হত। আর লতা জাতীয় গাছপালা, আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে প্রত্যেককে এই ছিল জমি বন্টনের শর্ত। 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা' উপন্যাসে দেখি বাস্তুহারা মানুষগুলোকে বিভাস বলেছে—

> 'বড় গাছগুলান সরকার থিকা কাইটা দেওন অইছে। মাঝারিগুলানও কাইটা দিমু, কিন্তুক ছুটো গাছ, ঝোপঝাপ আপনেগো হগল রিফুজিগো সাফা কইরা লইতে অইব।''[১২]

সেই অনুযায়ী আমিন, চেনম্যান যারা থাকত তারা নির্দিষ্ট পরিমান জমি মেপে দিত এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য কর্মচারীরা বাঁশের খুঁটি দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করে দিত। 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসে দেখি—

> 'চেনম্যান যেমন যেমন জমি মাপছে, রাঁচি কুলিরা সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে জমির সীমানা ঠিক করে দিচ্ছে। আর পাটোয়ারি একটা মোটা খাতায় জমির হিসাব টুকে রাখতে লাগল।''[১৩]

নামের তালিকা অনুযায়ী এক এক করে নাম ধরে ডেকে প্রত্যেককে তাদের প্রাপ্য জমি বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা' উপন্যাসেও আমরা সেই একই চিত্র প্রত্যক্ষ করি। আমিন লা-ডিন, চেনম্যান ধনপত এবং পুনর্বাসন দপ্তরের কিছু কিছু কর্মী অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে জমি বন্টনের দায়িত্ব পালন করেছে।

ভারত সরকারের পরিকল্পনা ছিল আন্দামানে যারা বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাবে তাদের প্রত্যেক পরিবারকে চাষের জন্য দশ একর হিসাবে জমি, গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সহ অর্ধ একর জমি বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এছাড়া প্রথম নয় মাস প্রাপ্ত বয়স্করা প্রতি মাসে তিরিশ টাকা এবং নাবালক আশ্রয় প্রার্থীরা পনের টাকা করে অনুদান পাবেন। একে

বলা হত ক্যাশডোল। এছাড়াও জীবন যাপনের উন্নতির সহায়ক বিশেষ কিছু ছাড় দেওয়া হবে, যাতে করে বাস্তুহারা এই সমস্ত মানুষগুলো এক জায়গা থেকে আরেক অচেনা জায়গায় এসে অথৈ জলে না পড়ে যায়। 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা' উপন্যাসে আন্দামানের ফাস্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বজিৎ রাহা জানিয়েছেন—

> '... যে যার জমির একধারে নিজেদের ঘর তুলে নেবে। চাষের জমির পাশেই বাড়ি। এই বাড়ির সব মেটিরিয়াল—বাঁশ, টিন, দড়ি, কাঠ গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হবে। ... ঘর তোলা হলে অ্যাডাল্টদের মাথা পিছু পঁচিশ টাকা আর মাইনরদের মাথাপিছু পনেরো টাকা করে ক্যাশডোল দেওয়া হবে। সেই টাকায় উদ্বাস্তুরা নিজেদের ফ্যামিলি চালাবে।''[১৪]

জমি পরিষ্কার করে গৃহ নির্মাণ করা যেহেতু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তাই ততদিন পর্যন্ত ট্রানজিট ক্যাম্পেই তাদের থাকতে হত। 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসেও দেখি পালসাহাব তাই ছিন্নমূল মানুষগুলোকে বলেছে—

> 'যতদিন না নিজের নিজের কোঠি বানিয়ে নিতে পারবি ততদিন এখানেই থাকতে হবে।''[১৫]

আন্দামান এমনিতেই এক অজানা, দুর্জ্ঞেয় রহস্যে মোড়া দ্বীপ। কখন কোন দিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে তা ছিন্নমূল মানুষগুলোর কাছে একদমই অজানা। কানখাজুরা, বিছে, জোঁক, কালকেউটে প্রভৃতি জীবজন্তুর হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রতি মুহূর্তে সাবধান থাকতে হয়। অন্যদিকে সমুদ্রে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঙর। ফলে সর্বত্রই বিপদ। তার উপর অরণ্য নির্মূল করার জন্য আন্দামানের আদিম অধিবাসীরা বিশেষ করে জারোয়ারদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মাঝে মাঝেই তারা উদ্বাস্তুদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করেছে। তবুও তারই মধ্যে চলেছে জমি বন্টন এবং একই সঙ্গে জমির আগাছা পরিষ্কারের কাজ। নিজের নিজের জায়গা পাওয়ার পর পরিবারের সকলেই পূর্ণ উদ্যমে জমি পরিষ্কারের কাজে লেগে পড়েছে। 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা' উপন্যাসে দেখি জারোয়ারদের তীরে জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোহনবাঁশি কর্মকার। হরিপদর সামনে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়েছে কালকেউটে। কিন্তু তবুও যে নতুন জীবনের স্পন্দন তারা পেয়েছে তাকে কোনো বিপদ থামিয়ে রাখতে পারেনি। 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসেও একই চিত্র দেখেছি।

> 'পায়ের নিচে মাটি পেয়ে সেই মাটিকে তারা বড় ভালোবেসে ফেলেছে। প্রাণের সবটুকু উত্তাপ ঢেলে পরম মমতায় সেই মাটিকে তারা তৈরি করে নিচ্ছে। মাটি। মাটি। নোনা জলের মাঝখানে মিঠে মাটি। সেই মাটি পেয়ে মানুষগুলো মেতে উঠেছে। বিভোর হয়ে আছে।''[১৬]

প্রবল অস্তিত্ব সংকটে পতিত হয়ে এই সমস্ত মানুষগুলো দীর্ঘদিন ধরে অস্তিত্বের খোঁজ করে চলতে চলতে আজ তারা আন্দামানে মাটি খুঁজে পেয়েছে। অস্তিত্বের শিকড়ে টান পড়া এই মানুষগুলো পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর তীরে যে জীবন গড়ে তুলেছিল, আজ বহুদূরে খণ্ডিত দেশ, দ্বিখণ্ডিত আত্মাকে বহন করেও আন্দামানের এই প্রতিকূল পরিবেশে সেই শিকড়েরই সন্ধান করে চলেছে। অধঃপতিত মৃত্যুলাঞ্ছিত এই মানুষগুলো চারিদিকে মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়েও যেন জীবনের মহাসংগীত গেয়ে চলেছে—এমনই অটুট তাদের প্রাণশক্তি। হাজার প্রতিকূলতা, হাজার বিঘ্ন-বিপদ অতিক্রম করেও তারা জমিতে ধানের বীজ বপন করেছে, ফেলে আসা অতীতের সেই দগদগে ঘা একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে। দেশভাগ তাদের সব কেড়ে নিয়েছে এমনকি তাদের জাত-পাত-পেশা—সবই কেড়ে নিয়েছে। তাদের মধ্যেকার যে সীমারেখা ছিল, যে ভেদাভেদ ছিল দেশভাগ সেই ভেদাভেদ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। কেউ জেলে, কেউ তাঁতি, কেউ নাপিত, কেউ বারুজীবী, কেউ সোনারু, কেউ যুগী—সকলেই তারা এখন রিফিউজি বা উদ্বাস্তু। আন্দামানে এখন তারা সকলেই চাষি। 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা' উপন্যাসে দেখি স্বাধীনতা সংগ্রামী শেখরনাথ যখন উদ্বাস্তু মানুষগুলোর সঙ্গে তাদের পূর্ব জীবনের কথা বলেছেন তখন তাদের এই পেশা পরিবর্তনের আক্ষেপ ধরা পড়েছে। মথুর সাহাকে যখন শেখরনাথ তার পেশার কথা জানতে চেয়েছেন তখন সে আক্ষেপের সুরে বলেছে—

> 'দোকানদারি। চাউল ডাউল মশল্লাপাতি বেচতাম। আন্ধারমানে জমি চষতে অইব। ব্যবসাদার থিকা চাষি বইন্যা গ্যালাম।''[১৭]

এমনি আরো অনেকেই তাদের পেশার পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। গণেশ পাল, যার কাজ ছিল ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করা, সে তার আক্ষেপের কথা জানিয়েছে—

'তারও খানিকটা আক্ষেপ, চোদ্দোপুরুষের কুলকর্ম ছেড়ে তাকেও কৃষক হতে হয়েচে।''[১৮]

তবুও বেঁচে থাকার ঐকান্তিক বাসনায়, অস্তিত্বের সন্ধানী এই মানুষগুলো আন্দামানে গড়ে তুলল নিজেদের বাসভূমি।

জাত না থাক তবুও জাতের মাহাত্ম্য, অন্ধ সংস্কার তাদের মধ্যে রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে, শিরায়, উপশিরায়, মনোজগতের প্রতিটি স্তরে পুরো মাত্রায় বজায় ছিল। উপযুক্ত সময়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কলহ-বিবাদ, অশ্লীল শব্দের আদানপ্রদান, অবৈধ প্রণয়, সামান্য জায়গা নিয়ে মারামারি যা অতীত দিনে ফেলে এসেছিল, সবই ফিরে এল আন্দামানে। ধান-আর গানের বাংলা, পদ্মা আর ধলেশ্বরীর বাংলা নতুন রূপে দেখা দিল আন্দামানে। তাই সমস্ত দিনের পরিশ্রম লাঘব করার জন্য তারা সকলে মিলে সন্ধ্যায় গানের আসর বসিয়েছে। উদ্ধব বৈরাগী, হরিপদ বারুই, মোহনবাঁশি কর্মকার পূর্ববঙ্গের দেহতত্ত্বের গান, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি গানের ডালি সাজিয়ে বসে। মুগ্ধ হয়ে শোনে বাকিরা আর শুনতে শুনতে গানের সুরে ভেসে চলে যেতে চায় ফেলে আসা অতীত দিনের স্মৃতির রাজ্যে। আবার কখনো গানের ভাষায় প্রাণ খুঁজে পায় ধ্বস্ত মানুষগুলো। জীবনে কত বাধা বিঘ্ন থাকে কিন্তু তাই বলে ভয় পেয়ে মনমরা হয়ে বসে থাকলে তো চলে না। নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কথাই যেন উদ্ধব বৈরাগী তার গানের কথায় বলে—

''গোরানাম লইতে অলস
করোনা রসনা
যা হবার তাই হবে।
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে
বলে কি
ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?''[১৯]

প্রফুল্ল রায় নিজে একজন উদ্বাস্তু সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে এবং নিজের কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনে আন্দামানে এসেছেন। বাস্তুহারাদের এই কলোনি নির্মাণের চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন নিজের চোখে। ফলে ধীরে ধীরে এই অন্তহীন অন্ধকারে থাকা মানুষগুলো কিভাবে তাদের বাসভূমি গড়ে তুলেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় আমরা পাই প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে। কিভাবে গৃহহীন, জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত মানুষগুলো আস্তে আস্তে একটা সমাজ গড়ে তুলছে তার প্রতিচ্ছবিও আমরা প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে পাই। অস্থির জলে জলছবি তৈরি হয় না, জলছবি তৈরি হয় স্থির জলে। মানুষের অস্তিত্ব যখন চরম সংকটে, যখন হঠাৎ করেই তাকে বলে দেওয়া হয় এতদিনের চেনা, জানা দেশ—যা ছিল তার একান্ত, আপন জন্মভূমি এখন আর তার দেশ নয়—তখন সেই দিশাহারা মানুষগুলোকে নিয়ে কোনো সমাজের চিত্র তৈরি হয় না। যখন তারা থিতু হয়ে বসে, নতুন করে মাটি পেয়ে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখে—তখনই সেই মানুষগুলোকে নিয়ে তৈরি হয় সমাজ। তৈরি হয় জাতপাতের ভেদাভেদ। সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব সংঘাতের। এই সবের মধ্য দিয়েই সমাজ এগিয়ে চলে। তাই দেখি উদ্বাস্তু মানুষগুলো যখন বাঁচার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে পশুর মত জীবন যাপন করেছে তখন তাদের মধ্যে কোনো জাতপাতের ভেদাভেদ ছিল না। তখন তাদের একটাই জাত—তারা উদ্বাস্তু। কিন্তু আন্দামানে আসার পর তাদের মধ্যে সেই জাতপাতের বিচার, একতিল জায়গার জন্য মারামারি, পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়—এই বিষয়গুলি আবার দেখা দিয়েছে। 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসে দেখি উজানী বুড়ি নিত্য ঢালীকে বলেছে—

'নিত্যা তুই কি ভুইলা গেলি তরা ঢালীর জাত। আর আমরা কাপালী। যে সে কাপালী না, শিউলি কাপালী। পাগলচান আমাগো গুরু। ভিন জাতের লগে কি আমাগো বিয়া হয়, না হইতে পারে।''[২০]

'শতধারায় বয়ে যায়' উপন্যাসে দেখি কিছুক্ষণ আগেই জাহাজে মৃত্যু ভয়ে শঙ্কিত ভয়ার্ত যোগেন বিশ্বাসকে মেয়ের বিয়ে দেবার কথা বললে এক লহমায় তার মূর্তিটাই গম্ভীর হয়ে যায়। হবু জামাতাকে সে প্রশ্ন করেছে—

'''মশায়ের নাম?'
... শিরি (শ্রী) হরিপদ বিশ্বেস্—'
'পিতা?'
'ঈশ্বর জগন্নাথ বিশ্বেস'
'নিবাস?'
'খুইলনে (খুলনা) জিলা। পাকিস্তান'
'গেরাম?'
'আছের পুর।'
'... শিউলি, না ধানী?'
'ধানী।'
কোন্ গুরুর শিষ্য? হরিচান (হরিচাঁদ), গুরুচান, না পাগলচান?'
'হরিচান।'[২১]

মানব চরিত্রের এই যে বৈচিত্র্যমণ্ডিত রূপ তা প্রফুল্ল রায় নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। উদ্বাস্তু মানুষগুলো কিভাবে নতুন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে, নতুন সমাজ গড়ে তুলছে তার চিত্র আমরা এখান থেকে খুঁজে নিতে পারি।

আবার দেখি এক মুঠো মাটি তো দূরের কথা একটা সময় প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে দেশ ত্যাগ করা মানুষগুলো আন্দামানে এসে নিজের মত জমি পেয়ে নিত্য নতুন ফন্দি আঁটতে শুরু করেছে। সামান্য একটু জমির জন্য রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে। 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা' উপন্যাসে দেখি লক্ষ্মণ ভক্ত এবং নবদ্বীপ কুণ্ডু—এই দুজনের জমি নিয়ে গোলমাল হয়েছে। লক্ষ্মণ লুকিয়ে চুরিয়ে বাঁশের সীমানা থেকে বাঁশ খুলে নবদ্বীপের জমির দশহাতের মত জায়গা নিজের দিকে করে নিয়েছে। এর জন্য বীর বিক্রমে ঝগড়া চলছে উভয়ের মধ্যে। নবদ্বীপ ফরিদপুরের রক্তের ক্ষমতা দেখাচ্ছে আর লক্ষ্মণ খুলনার। অর্থাৎ মনে প্রাণে তারা গোটা ফরিদপুর আর খুলনা জেলাকেই আন্দামানে নিয়ে চলে এসেছে যেন। শেষ পর্যন্ত মারাত্মক ঘটনা ঘটে যায়—

> 'অসহ্য ক্রোধে এবং উত্তেজনায় দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে চিক্কুর ছাড়ল লক্ষ্মণ।— 'আমাগেরে নিপাত করবি? দেকি, মায়ের দুদ (দুধ) কয় স্যার (সের) খাইচ! খানকির ছাওয়াল না হলি আগুয়ে (এগিয়ে) আয়; তোর পোঙায় কত রস হছে, দেকুয়ে (দেখিয়ে) দি। আয়—আয়—''[২২]

তারপর বাঁশের খুঁটি দিয়ে আচমকা নবদ্বীপের মাথায় সজোরে আঘাত করে। চারিদিক রক্তে ভেসে যেতে থাকে। এতো আন্দামানের কোনো দৃশ্য নয়। যেন মনে হবে পূর্ব বাংলার কোনো এক অখ্যাত গ্রামের দু'জন মানুষের কলহ। অর্থাৎ লেখক দেখাতে চাইছেন আন্দামান কিভাবে ধীরে ধীরে এক টুকরো বাংলা হয়ে উঠছে।

আন্দামানে নতুন বাঙালি সমাজ গড়ে উঠছে। ভালো-মন্দ, সঠিক-বেঠিক, কলহ-মিলন প্রভৃতি যাপিত জীবনের দৈনন্দিন চিত্র, গ্রাম-বাংলার চিরচেনা ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করছি আন্দামানের উদ্বাস্তু কলোনিতে। পরনিন্দা-পরচর্চা যা গ্রাম বাংলার একটি অতি পরিচিত শব্দ—তাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসে কুমি চরিত্রটি তার প্রমাণ। পাশাপাশি এসেছে প্রেম, ভালোবাসা, সন্দেহ, অবৈধ প্রণয় ইত্যাদি মানব চরিত্রের কিছু কিছু প্রবৃত্তি। 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা' উপন্যাসে দেখি সনাতন দাস বৃন্দাবনকে তীব্র আক্রোশে গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বৃন্দাবনকে উদ্দেশ্য করে সে বলেছে—

> 'উই খানকির পুত আমার বউরে ভাগাইয়া লইয়া আন্ধারমানে (আন্দামানে) পলাইয়া আইছে। ওই যে মাগি মুহে (মুখে) কাপড় গুইজা কানতে (কাঁদতে) আছে ও আমার বউ। মাগি বেবুশ্যার থিকাও খারাপ কত্তা।''[২৩]

'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসেও দেখি যোগেন করাতির সঙ্গে হরিপদর স্ত্রী তিলি শেষ পর্যন্ত অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়েছে। অন্যদিকে মানব মনের সুকুমার প্রবৃত্তি প্রেম-ভালোবাসাও আমরা লক্ষ্য করি হারানের মধ্যে। কাপাসী ধর্ষিতা, অপ্রকৃতিস্থ জেনেও সে তাকে প্রকৃত অর্থেই ভালোবেসেছে। এই ভালো-মন্দ নিয়েই তো সমাজ গড়ে ওঠে। আন্দামানে বাস্তুহারা মানুষগুলো একটা সমাজ তৈরি করেছে। সমাজে যেমন একটা কর্তৃত্বময় ক্ষমতা থাকে, এখানেও দেখি ছিন্নমূল মানুষগুলো নিজেদের মত করে দু-এক জনকে মান্যতা দিয়ে চলে। 'নোনা জল মিঠে মাটি' উপন্যাসে দেখি তারা নিজেরাই রসিক শীল আর বাসিনী বুড়িকে সমাজের মাথা বলে মান্যতা দিয়েছে। তাই দেখি নিত্য ঢালী যখন লা-তে আর পানিকরকে তার ঘরে এনে তুলেছে এবং তাদের থাকতে দিয়েছে—সেই খবর পেয়ে রসিক শীল বলেছে—

> ''এ ক্যামুন কথা, আমরা কি মরছি! আমাগো জানাইল না, শুনাইল না, লুকাইয়া ছাপাইয়া বিদ্যাশিরে বিজাতিরে ঘরে আইনা তুলল! আমরা থাকতে বিদ্যাশী বিজাতি আপন হইল! মানের ডর নাই, ধম্মের ডর নাই।''[২৪]

পরক্ষণেই তার মনে হয়েছে এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে হুমকির সুরে বলেছে—

> 'সোমাজের ডর নাই, সংস্কারের ডর নাই? নিত্যার বুকের পাটাখান কতবড় হইছে দেখুম।''[২৫]

বস্তুত আন্দামানে কিভাবে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে উঠছে তা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রফুল্ল রায় সরজমিনে উপস্থিত ছিলেন। ফলত তাঁর চোখে দেখা বাস্তব ছবি আমরা এখানে পাই। বিশেষ করে সাংবাদিক সুলভ মনোভাব তাঁকে বর্ণনা ভঙ্গির এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকটাই নিরপেক্ষ রেখেছে। দীর্ঘ ন'মাস তিনি আন্দামানে কাটিয়েছেন। ফলে তাঁর চোখের সামনে ধীরে ধীরে উদ্বাস্তু কলোনি, তাদের সমাজ গড়ে উঠতে দেখেছেন। জঙ্গল কেটে ভয়ঙ্কর বিষধরদের সঙ্গে লড়াই করে উদ্দাম সাহসিকতা আর মনের জোরে তারা গড়ে তুলেছে উদ্বাস্তু কলোনি। সেই সত্য কাহিনিই প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. কল্যাণ মৈত্র ও লেখকের সাক্ষাৎকার, গল্পসরণি পত্রিকা, সম্পাদক— অমর দে, প্রফুল্ল রায় সংখ্যা, পৃ. ৩৯৯।
২. প্রফুল্ল রায়, শতধারায় বয়ে যায়, ২০১৭, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৪৩৮।
৩. তদেব, পৃ. ৪৩৮।
৪. তদেব, পৃ. ৪৩৯।
৫. তদেব, পৃ. ৪৩৯।
৬. তদেব, পৃ. ৪৩৯।
৭. তদেব, পৃ. ৪২৫।
৮. প্রফুল্ল রায়, নোনা জল মিঠে মাটি (প্রফুল্ল রায় রচনাসমগ্র-২) ২০০৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২০।
৯. তদেব, পৃ. ৪৪।
১০. তদেব, পৃ. ৩৮।
১১. তদেব, পৃ. ৩৬।
১২. প্রফুল্ল রায়, উত্তাল সময়ের ইতিকথা, ২০১৭, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৬৯।
১৩. প্রফুল্ল রায়, নোনা জল মিঠে মাটি (প্রফুল্ল রায় রচনাসমগ্র-২) ২০০৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৪০।
১৪. প্রফুল্ল রায়, উত্তাল সময়ের ইতিকথা, ২০১৭, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৭৬।
১৫. প্রফুল্ল রায়, নোনা জল মিঠে মাটি (প্রফুল্ল রায় রচনাসমগ্র-২) ২০০৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৭।
১৬. তদেব, পৃ. ৭৩।

১৭. প্রফুল্ল রায়, উত্তাল সময়ের ইতিকথা, ২০১৭, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৯৩।
১৮. তদেব, পৃ. ৯৩।
১৯. প্রফুল্ল রায়, নোনা জল মিঠে মাটি (প্রফুল্ল রায় রচনাসমগ্র-২) ২০০৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৫০।
২০. তদেব, পৃ. ১১১।
২১. প্রফুল্ল রায়, শতধারায় বয়ে যায়, ২০১৭, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৪৬০।
২২. প্রফুল্ল রায়, উত্তাল সময়ের ইতিকথা, ২০১৭, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩২১-২২।
২৩. তদেব, পৃ. ২৬১-৬২।
২৪. প্রফুল্ল রায়, নোনা জল মিঠে মাটি (প্রফুল্ল রায় রচনাসমগ্র-২) ২০০৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৪৮।
২৫. তদেব, পৃ. ১৪৮।

আকর গ্রন্থ

১. প্রফুল্ল রায়, উত্তাল সময়ের ইতিকথা, ২০১৭, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
২. প্রফুল্ল রায়, কেয়াপাতার নৌকা, ২০১৬, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
৩. প্রফুল্ল রায়, নোনা জল মিঠে মাটি (প্রফুল্ল রায় রচনা সমগ্র-২) ২০০৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।
৪. প্রফুল্ল রায়, বিন্দুমাত্র, ১৯৯৯, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।
৫. প্রফুল্ল রায়, শতধারায় বয়ে যায়, ২০১৭, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কলের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের ৭৫ বছর (১৯২৩-৯৭), ২০০৫, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।
২. অর্পিতা বসু (সম্পাদনা), উদ্বাস্তু আন্দোলন ও পুনর্বসতি সমসাময়িক পত্র পত্রিকায়, ২০১৭, গাঙচিল, কলকাতা।
৩. অলোক রায়, বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, ২০০৯, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা।
৪. অশ্রুকুমার শিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, ২০০৮, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
৫. অশ্রুকুমার শিকদার, ভাঙাবাংলা ও বাংলা সাহিত্য, ২০১৮, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।
৬. আশিস হীরা, উদ্বাস্তু ইতিহাসে ও আখ্যানে, ২০১৯, গাঙচিল, কলকাতা।
৭. প্রসূন বর্মন (সম্পাদনা), দেশভাগ দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত, ২০১৭, গাঙচিল, কলকাতা।
৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ২০০৩, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।
৯. সেমন্তী ঘোষ (সম্পাদনা), দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, ২০১১, গাঙচিল, কলকাতা।
১০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ২০০৯-২০১০, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা।
১১. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশান আধুনিক ভারতের ইতিহাস (অনুবাদ : কৃষ্ণেন্দু রায়), ২০১০, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

পত্র-পত্রিকা

১. অমর দে (সম্পাদনা) গল্পসরণি (একবিংশতিতম বর্ষ : বার্ষিক সংকলন ১৪২৩য়২০১৭) প্রফুল্ল রায় বিশেষ সংখ্যা, ২০১৭, কলকাতা।
২. গৌরীশঙ্কর সরকার (সম্পাদনা) ঐক্য, প্রফুল্ল রায় সম্পাদনা সংখ্যা, ২০১৮, পশ্চিম মেদিনীপুর।

সৌমেন মুখোপাধ্যায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়,
পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন : বাংলা উপন্যাস

মণিশঙ্কর অধিকারী

সাহিত্য সমাজজীবন বিবিক্ত নয়—তা জীবনের দর্পণ। মানবজীবন ও সমাজের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয় সেই দর্পণে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার অন্যতম শাখা উপন্যাসেও একটি সময়ের সমাজ ও সেই সমাজের বিভিন্ন চরিত্রের কথকতা প্রাধান্য পায়। উপন্যাসও তাই সমাজ ও মানবজীবন বিবিক্ত নয়। উপন্যাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ইতিহাসের নানা পালাবদলের কাহিনি। বাংলা উপন্যাস ধরে রেখেছে বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস—তার নানা বেদনা ও সুখানুভূতি। অভিজ্ঞতা তার পরতে পরতে, সরসতা তার শিরায় শিরায়, জীবন-উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে।

বিশ থেকে চল্লিশের দশকের মধ্যে ঘটেছিল বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারিকে ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), জাপানী আক্রমণ (১৯৪১), ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২), মেদিনীপুরের ভয়াবহ বন্যা (১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন (১৯৪৩), নৌ-বিদ্রোহ (১৯৪৬), রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা (১৯৪৬-১৯৪৭), দেশ বিভাজন ও খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ (১৯৪৭) ও উদ্বাস্তু স্রোত (১৯৪৭-১৯৫০)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতকে করে তুলেছিল পঙ্গু। যুদ্ধে লিপ্ত ব্রিটেন ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে বিধ্বস্ত ভারতকে ব্রিটেন তখন যুদ্ধে টেনে নেয়। যুদ্ধের প্রবল শক্তির কাছে ব্রিটিশ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশ থেকে রসদ সংগ্রহ করতে থাকে। কৃষক ও শ্রমিকরা হয় শোষিত, মধ্যবিত্ত মানুষ হয়ে পড়ে অসহায়। এই সময় দেশেও বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে সমস্ত দেশে যখন প্রত্যক্ষ গণ অভ্যুত্থান দেখা দেয় তখন ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখবার শেষ চেষ্টায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৪২-এর আন্দোলনে ভারতের লক্ষ কোটি প্রাণ যেমন আত্ম বলিদান দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদীর মদতপুষ্ট স্বার্থান্বেষী মহাজন এবং কালোবাজারি মজুতদারের দল দেশের লোকের রক্ত শুষে খেয়েছে। নিরঙ্কুশ শোষণের অনিবার্য ফল হিসেবে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত। সমগ্র দেশে দেখা দেয় মন্বন্তর। সেদিন যুদ্ধ আর আকাল হরণ করেছিল বাংলার মানুষের বস্ত্র, মুনাফার লোভে চোরাকারবারীর দল কন্ট্রোলের কাপড় কালোবাজারে চড়া দরে বিক্রি করেছিল। তার ফলস্বরূপ হতদরিদ্র মানুষ প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় দিন যাপন করেছিল। সেই সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে সন্তোষকুমার ঘোষ বলেছেন—

> "..... সেই সব দুঃস্বপ্নের নিষ্প্রদীপ, পণ্যমূল্যের উল্লম্ফন, মন্বন্তর, পাষাণপথে নিরন্নের শব। দলে দলে পুরুষ, ভিখারি, দলে দলে নারীর পিছনে নিছক লোভাতুর শরীর-শিকারি। অর্থনীতির আণবিক আঘাতে মধ্যবিত্ত সমাজে যৌথ বলে যা কিছু সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল, জীবনকে যদি একটা সংগ্রাম বলি, তাহলে তার নানা রণাঙ্গন জুড়ে ঘটেছিল সুন্দরের পশ্চাদপসরণ ও প্রস্থান।"[১]

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। তারপর একে একে দেখা দেয়—১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশ বিভাজন, ভারতের পক্ষে লিখিত স্বাধীনতা, পাকিস্তান থেকে বাস্তুহারাদের এদেশে আগমন। বেকার সমস্যা, দারিদ্র, মধ্যবিত্ত সমাজে ভাঙন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বাস্তুহারা সমস্যা বাংলায় ভয়ঙ্কর রূপ নেয়।

অধিকারী, মণিশঙ্কর : দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন ঃ বাংলা উপন্যাস
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 1, June 2020, Page : 46-50, ISSN 2249-4332

সাহিত্যিকরা দেশ-কাল-পরিস্থিতির চিত্র স্বরূপে বা ব্যঞ্জনায় সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সমাজ-জীবনের ছবি অনেকগুলি বাংলা উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ছুরিতে ছিন্ন-ভিন্ন বাঙালির বাসভূমি পরিণতি হয় শকুনি ও হায়েনার বিচরণক্ষেত্রে। বহু মানুষ ছিন্নমূল হয়ে নিজস্ব দেশ বেছে নিতে গিয়ে হয়ে পড়েন শরণার্থী। তারা সব কিছু হারিয়ে গাছতলায় বা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। উদ্বাস্তু সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করে এই সময়। তখন প্ল্যাটফর্মে, গাছতলায়, পথের ধারে, শরণার্থী শিবিরে মানুষের ঢল। তারা আশ্রয় পেতে চাইল তাদের স্বদেশ ছেড়ে। ধর্মরক্ষা ও আব্রুরক্ষার জন্য মানুষ চরম দুর্দশার শিকার হয়। যে বাস্তুভিটা ছিল তার নিজস্ব, যেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কল্যাণকামনা করে সে দিয়েছে সন্ধ্যাপ্রদীপ সেই ভিটা এখন আর তার নয়—এই ঘটনা ভিটেহারা মানুষের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত।

উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব এবং পূর্বভারতে পূর্ব-পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে দেশ বাছাই ও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছিন্নমূল মানুষের আসা-যাওয়া চরম অস্থিরতা ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যত না মুসলমান ভারত ত্যাগ করেছেন, তার চেয়ে বহুগুণ হিন্দু ও মুসলমান ভারতকেই ভবিষ্যতের আবাস হিসেবে বেছে নিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের এই উদ্বাস্তু স্রোত, তাদের জীবনযুদ্ধ সংবেদনশীল প্রতিটি মানুষকেই বেদনাহত করেছে। দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের অস্থিরতা ও বাসস্থান খুঁজে ফেরার বেদনার্ত কাহিনি বাংলা উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। বাস্তু থেকে উৎখাত হওয়া ছিন্নমূল মানুষের জীবন যন্ত্রণা, ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর বাস্তবতার প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসগুলোতে। এ প্রসঙ্গে প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকা', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', অসীম রায়ের 'দেশদ্রোহী', বনফুলের 'ত্রিবর্ণ', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম', 'অর্জুন', অমরেন্দ্র ঘোষের 'ঠিকানা বদল', 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে', হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি', নারায়ণ সান্যালের 'বল্মীক', 'বকুললতা পি. এল. ক্যাম্প', শক্তিপদ রাজগুরুর 'তবু বিহঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যায়।

দেশভাগের যন্ত্রণা, তার প্রভাব মানুষকে কতটা উন্মনা করে তুলেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় অসীম রায়ের 'দেশদ্রোহী' উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক চরিত্র ভবানীপ্রসাদ তার স্বপ্নের দেশ অখণ্ড বাংলার কামনা করেছেন। তাঁর যন্ত্রণা তো বাঙালি জীবনেরই গভীরগত যন্ত্রণা। অমরেন্দ্র ঘোষের 'ঠিকানা বদল', 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' উপন্যাসে দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের কথকতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। জ্যোতির্ময়ী দেবী 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে দেখিয়েছেন নারী দুই দেশেই পুরুষের কাছে ব্যবহার্য সামগ্রীর মতো। মানসিক বিপন্নতা, নারী নির্যাতন তথা পুরুষের নিষ্পেষণের হাত থেকে বাঁচতে মানবিক অধিকারবোধ প্রকাশের চেষ্টা করেছে সংগ্রামরত নারী। এখানে দেখানো হয়েছে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যায় জেরবার হয়ে অস্তিত্ব টেকানোর সংগ্রামে নারীরা রক্ষণশীলতার বেড়াজাল অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। বনফুলের 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাসটিও দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার প্রেক্ষাপটে লেখা। এই উপন্যাসে গণেশ, বুলি, কাউ, শামুক প্রভৃতি চরিত্র বেঁচে থাকার জন্য সুস্থ আশ্রয়ের সন্ধান করেছে। যদিও তাদের সেই আশ্রয়-সন্ধান ব্যর্থ হয়েছে।

প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকা' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের গ্রামজীবনের পাশাপাশি ছিন্নমূলের বেদনা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৪০-৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী বছরগুলিতে পূর্ববঙ্গে ধলেশ্বরী নদী তীরবর্তী রাজদিয়া শহরের জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তারই ছবি ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। সেই সঙ্গে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবন সর্বাঙ্গীন রূপ পেয়েছে। কলকাতা থেকে অবনীমোহন এক পুজোর ছুটিতে সপরিবারে রাজদিয়ায় শ্বশুরবাড়ি আসেন। কিন্তু ছুটি শেষ হলেও তিনি আর কলকাতা ফিরে যাননি। রাজদিয়াতেই থেকে যান। তাঁর ছেলে বিনু বারো বছর বয়সে আসে এখানে। কৈশোর থেকে তার যৌবন কাটে এখানেই। রাজদিয়ার গ্রামপ্রকৃতিকে বিনুও বাবার মতো ভালোবেসে ফেলে। এই গ্রামপ্রকৃতি তাকে দিয়েছে জীবনীশক্তি ও বাঁচার আনন্দ। ধলেশ্বরী নদী, গোয়ালন্দ থেকে রাজদিয়াগামী স্টিমার, স্টিমারের মাল্লা দেশী নৌকোর মাঝি, তাদের বিচিত্রসুর, স্টিমার ঘাটের ফিনে গাড়ি বিনুকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। ঝুমা, ঝিনুক আর যুগলের সাহচর্যে বিনু বড় হয়ে ওঠে। বিনুর বাবা অবনীমোহনও পূর্ববঙ্গের ঐশ্বর্যময়ী রূপে মুগ্ধ। তাঁর মনে হয়েছে, ''পূর্ববাংলাকে না চিনলে বাঙলাদেশকে চেনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।''

কিন্তু উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে আমরা অন্য চিত্র পাই। অবনীমোহনের পূর্ববাংলাকে আপন করে নেবার প্রয়াস, সাফল্য ও ব্যর্থতার কাহিনি উপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্বে ধরা পড়েছে। প্রথম দিকের মুগ্ধ বিস্ময় ও সহজ আনন্দ ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে কীভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের টানাপোড়েনে পূর্ববাংলার রূপ বদলে যাচ্ছে, ১৯৪২ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর অভিঘাতে বিনু কিভাবে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে তা এই পর্বে ধরা পড়েছে। বিনুর দাদু হেমনাথ মিত্র ছিলেন রাজদিয়ার প্রাণপুরুষ, রাজদিয়ার মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে যাঁর জীবন একসূত্রে গাঁথা ছিল। একদিন তাঁরও সব বিশ্বাস ভেঙে গেল। তাঁর চারদিকের সমস্ত আশ্রয় আর মূল্যবোধ ভেঙে যাচ্ছিল। এই ঘটনায় হেমনাথের হৃদয় হয়ে ওঠে ক্ষতবিক্ষত। ১৯৪৭-৫০-এর অন্ধকার দিনগুলিতে বাংলার হিন্দু-মুসলমান ছিল অন্ধ। মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। সেই দেশভাগ ও দাঙ্গার আগুনে ঝলসে গিয়েছিল পূর্ববঙ্গ। ১৯৪৭-এর উত্তেজনার ঢেউ স্তিমিত হয়ে এলেও এর পরে তিন বছর পূর্ব পাকিস্তানের কোনো উন্নতি হয়নি, গরীব মুসলমান চাষী সুখের সন্ধান পায়নি। হিন্দুরা ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গে চলে যায় আশ্রয়ের খোঁজে। বিনুর সঙ্গী যুগলও হিন্দুস্থানে চলে আসে। হেমনাথ দাঙ্গায় নিহত ভবতোষের মেয়ে ধর্ষিতা ঝিনুককে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। হেমনাথের সমস্ত বিশ্বাস সে দিন ভেঙে যায়। ধর্ষিতা ঝিনুককে নিয়ে বিনুও চলে আসে কলকাতার উদ্দেশ্যে। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসার সময় বিনু ভীষণ কষ্ট পায়। তার মনে হয়েছে 'কৈশোরের এই রম্যভূমি যৌবনের এই স্বর্গে' আর কোনদিন হয়তো ফেরা হবে না। এরপর তার চোখ পড়ে ঝিনুকের ওপর—

> ''মেয়েটাকে দেখতে দেখতে অপার স্নেহে অসীম করুণায় তার বুক ভরে যেতে লাগল। এই সময় হঠাৎ মনে পড়ল তার বাবা অবনীমোহন পশ্চিমবাংলার মানুষ, মা পূর্ব বাঙলার মেয়ে। তার বুকের একধারে পূর্ববাঙলা, আরেক ধারে পশ্চিম বাঙলা। তার রক্তের এক স্রোত পদ্মা, আরেক স্রোত গঙ্গা। আর কোলের কাছে এই মেয়েটা—এই ঝিনুক? সে তো পূর্ব বাঙলার লাঞ্ছিত অপমানিত আত্মা। তাকে নিয়েই সে কলকাতায় চলেছে।''

বিনুর এই ভাবনার মধ্যে নতুন দিনের একটা ইঙ্গিত যেন আমরা পাই। বিনুর নতুন দিন যে আসবে, সব অপমানের যে একদিন অবসান ঘটবে তার ইঙ্গিত হেমনাথের উক্তির মধ্যে আমরা পাই—

> ''মনে রেখো সব মানুষই পশু হয়ে যায়নি; যেতে পারে না।''

তার বিশ্বাস একদিন মানবতার জয় ঘটবেই। পূর্ব বাঙলার লাঞ্ছিত অপমানিত মানবাত্মা যে একদিন তার মর্যাদার আসন লাভ করবে উপন্যাসের শেষে এই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে মূল্যবোধের অবক্ষয়, নারী নির্যাতন ও সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষিত উন্মোচিত হয়েছে। দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিপর্যয় কীভাবে পূর্ববঙ্গের শান্ত গ্রামজীবনকে দলিত মথিত করে দেয় তার বিবরণ পাই এই উপন্যাসে। কিশোর সোনার চোখ দিয়ে পাঠক এই বিপর্যয়ের দিনগুলিকে দেখেছে। উপন্যাসে ১৯৩৫-৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গে শীতলক্ষ্যা নদী-সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। একদিকে শীতলক্ষ্যা, অন্যদিকে মেঘনা; একদিকে লাঙলবন্দ, অন্যদিকে গোয়ালন্দ, তার মাঝে গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ, খাল, বিল ও চর। ধনী-দরিদ্র-মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমানের সেখানে বাস। গ্রামনির্ভর জীবন তাদের। এদের সকলের জীবন আলেখ্য এই উপন্যাস। ঢাকা-কলকাতা থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের দূরাগত তরঙ্গে শান্ত গ্রামজীবনে চাঞ্চল্য, সামাজিক অস্থিরতা, দেশবিভাগের প্রস্তুতি ও দেশবিভাগের পরবর্তী ঘটনা এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু সব কিছুকে অতিক্রম করে বড় হয়ে উঠেছে অখণ্ড জীবনবোধ ও দেশচেতনা। উপন্যাসে মণীন্দ্রনাথের কামনা ''জীবনের হারানো সব নীলকণ্ঠ পাখিরা ফিরে এসে রাতের নির্জনতায় মিশে থাক।'' কিন্তু তাঁর সে কামনা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বেদনার্ত। তাঁর এই বেদনা ব্যক্তিগত হলেও এই বেদনার যে সমাজগত, পরিবারগত, দেশকালগত বাস্তবরূপ আছে তা দেশবিভাগের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমাজজীবনে ধরা পড়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসের অনেক চরিত্রই অনেক কিছু

পায়নি। বড় কর্তা মণীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পোষা হাজার হাজার নীলকণ্ঠ পাখিকে ফিরে পান নি, পান নি পলিনকে। তাঁর স্ত্রী ফিরে পান নি মণীন্দ্রনাথকে। ক্ষুধার্ত জালালি খেতে না পেয়ে বিলে ডুবে মরেছে। মালতী তার সুখকে পায়নি। ফেলু আন্নু বিবিকে রাখতে পারেনি, আবার হাজি সাহেবের মাইজলা বিবি পায় না তার মনের মানুষ ফেলুকে। ঈশম শেখ রাখতে পারে না তার তরমুজ খেতকে। তবু নীলকণ্ঠ পাখির অন্বেষণে সবাই চলেছে সারাজীবন।

বাস্তুহারা মানুষের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে এই উপন্যাসের বহু চরিত্রের কণ্ঠে। সমস্ত স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার বেদনায় সোনা বলেছে—

> ''পদ্মপুরাণ তো আমি নিজেই, মাগো সারাজীবন আমি চাঁদ সদাগর পাঠ করেছি—তাই বেহুলার ....''

—এই অকথিত উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পায় নীলকণ্ঠ পাখির অন্বেষণ। এই পাখির প্রাপ্তিই পারে ম্রিয়মান জীবনকে নতুন ভাবে, নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করতে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম', 'অর্জুন' উপন্যাসে দাঙ্গা ও দেশবিভাগের চিত্র বর্তমান। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের বাঙালির জীবনের উথাল-পাতাল টানাপোড়েনের কাহিনি 'পূর্ব-পশ্চিম'। ধর্মকেন্দ্রিক বিভাজনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতার কারণে উদ্বাস্তু হওয়া মানুষের সমস্যা ও জীবন সংগ্রামের চিত্র ধরা পড়েছে উপন্যাসটিতে। প্রতাপ, মমতা, ফিরোজা, বুলা, মামুন প্রভৃতি উদ্বাস্তু মানুষের জীবন যন্ত্রণা নিদারুণভাবে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। ছিন্নমূলদের দারিদ্র, স্বার্থপরতার পাশাপাশি বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামের কথা 'অর্জুন' উপন্যাসে বিধৃত। অর্জুন এখানে মহাভারতের অর্জুনের মতো সমস্ত বিপর্যয় ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়।

হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে নারীর চোখ দিয়ে দেখা দেশভাগের অভিজ্ঞতা। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে রয়েছে মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশভাগের ঘটনা। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের পারিবারিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও জীবন সংগ্রাম উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য।

উদ্বাস্তু জীবনের কাহিনি নিয়ে নারায়ণ সান্যাল রচনা করেছেন 'বল্মীক' ও 'বকুললতা পি. এল. ক্যাম্প' উপন্যাস। 'বল্মীক'-এ একটি উদ্বাস্তু পরিবারের অবস্থা সংকটকে নিদারুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসে উদ্বাস্তু-সংকটে অভাবপিষ্ট হরিপদ চক্রবর্তী-পরিবারের আদর্শচ্যুতি, পুত্রবধূর সতীত্বে শ্বশুর-শাশুড়ির-ননদের সন্দেহ, পুত্রবধূ কামিনীর সমস্ত প্রলোভনকে দূরে সরিয়ে সতীত্ব রক্ষা ও দেবর বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে পরিবারের ভার নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসে নমিতা চরিত্রটিও অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। দুই দল উদ্বাস্তুর মধ্যে দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে নমিতার মৃত্যু হয়। এই উপন্যাস প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

> ''নারায়ণ সান্যালের 'বল্মীক' উপন্যাসে উদ্বাস্তুদের দুইদিনের ক্ষণভঙ্গুর উইঢিপির মত আচ্ছাদনের একটি স্থায়ী, নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ে পরিণত করার উদ্বিগ্ন, আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে অস্থির, সাধনার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই আত্ম-অবিশ্বাসে করুণ, দলাদলিতে উত্তপ্ত, বিরোধের নানা শাখাপথের স্রোতোতাড়িত সাধারণ পরিস্থিতির কেন্দ্রস্থলে একটি অভাবপিষ্ট ভদ্র পরিবারের আদর্শচ্যুতি, ইতর সন্দেহ ও মর্মান্তিক বন্ধনছেদের বর্ণনা সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহাকে একটি উচ্চতর ভাব সঙ্গতি দিয়াছে।''[২]

বনফুলের 'পঞ্চপর্ব' উপন্যাসে উদ্বাস্তু-সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসে ধর্মরক্ষার জন্য হিন্দু নারীর আত্মবলিদান, প্রাণরক্ষার জন্য হিন্দু পুরুষের ধর্মান্তর গ্রহণের মতো ঘটনার পাশাপাশি সম্পত্তি বিনিময়ের আইনঘটিত জটিলতার দিক তুলে ধরা হয়েছে।

শক্তিপদ রাজগুরুর লেখা 'তবু বিহঙ্গ' পশ্চিম রাঢ়ে বনভূমির প্রান্তে অবস্থিত রুক্ষ প্রান্তরে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু শিবির-জীবনের বিচিত্র কাহিনি। ভাগ্য বিড়ম্বিত উদ্বাস্তু মানুষের জীবনসমীক্ষা এখানে ধরা পড়েছে। উদ্বাস্তু শিবিরের একজন কর্মাধ্যক্ষ উদ্বাস্তুদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং তা আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। কপিল, সুরেশ, কচি, কমল, জিতেন ডাক্তার, নটবর, নিকুঞ্জ, মুরারি প্রভৃতি বিচিত্র সব চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্লোককে তুলে ধরেছেন লেখক।

OPEN EYES

শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' উপন্যাসে নীতার চিৎকার 'আমি বাঁচতে চাই' যেন প্রতিটি ছিন্নমূল মানুষের করুণ আর্তিকেই ব্যঞ্জিত করে।

দেশবিভাগের ফলে বিপর্যস্ত উদ্বাস্তু মানুষের জীবন যুদ্ধের কাহিনি আরও অনেক লেখকের উপন্যাসে বাণীরূপ লাভ করেছে। বাস্তুভূমি থেকে ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া মানুষের সেই অকথিত দুঃখ-দুর্দশার কাহিনি আমাদের বেদনাহত করে তোলে।

সূত্রনির্দেশ

১. সন্তোষকুমার ঘোষ, এই বাংলা, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৮।

২. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, পুনর্মুদ্রণ - ২০০০-২০০১, পৃ. ৭১১।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, পুনর্মুদ্রণ - ২০০০-২০০১।

২. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ - নভেম্বর ১৯৯৫।

৩. বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর, সমরেশ মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, বইমেলা, ২০০৮।

মণিশঙ্কর অধিকারী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলকাতা

একুশ শতকের বাংলা পত্র-পত্রিকায় চৈতন্যচর্চা

শ্রীবাস বিশ্বাস

বাংলা সাহিত্যের সূচনা লগ্ন থেকেই বাঙালির মধ্যে একটা মানবপ্রেমের বন্ধন ছিল। তবে সে ধারাটি ব্যাপ্ত ও বহুমুখী ছিল না। ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং তাঁকে কেন্দ্র করে মানব মহিমার পূর্ণ প্রকাশ, মানুষের ঈশ্বরত্ব এবং মানবপ্রেমের সংজ্ঞা ও স্বরূপ প্রতিভাত হলো বিশেষভাবে। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলার সমাজ-সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি ও ধর্মান্দোলনে দেখা দিল বড় মাপের পরিবর্তন। তাঁর আলোক সামান্য স্পর্শে এবং প্রেমে মানুষ নতুন করে প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পেল। ঘুচে গেল সবরকম বাধা-ব্যবধান। সমাজ অন্ধ-তমসা থেকে মুক্ত হল। সেখানে মানুষ তুচ্ছ নয়, ক্ষুদ্র নয়, ঘৃণ্য নয়, সবাই সমান। সবার মধ্যেই আছে ভাগবত-সত্তা। তিনি সমস্ত রকম ভেদাভেদ ঘুচিয়ে আচন্ডালে প্রেমদান করে সবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন এবং সবাইকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করলেন। মানবপ্রেমের এই বন্ধন সব দেশকালকে ছাপিয়ে গেল। শ্রীচৈতন্য হয়ে উঠলেন একজন যুগন্ধর মহাপুরুষ।

সমাজ সংস্কারক, প্রেমভক্তি সাধনার অগ্রদূত এবং নবজাগরণের পথিকৃৎ এই মহামানবের জীবনই হয়ে উঠেছে তাঁর বাণী। নিজের জীবনচর্চার মধ্যে দিয়েই তিনি প্রেমধর্মের আসল তত্ত্বকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে বলেছিলেন পাণ্ডিত্যের অহংকার, অর্থ-বিত্তের অহংকার শক্তির দম্ভ সবই অর্থহীন। নিঃস্বার্থভাবে ঈশ্বরপ্রেম ও জীবের প্রতি প্রেমই হল মানব জীবনের আসল সোপান। প্রেমই মানব জীবনের সারকথা। আর এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি বেছে নিলেন নাম সংকীর্তনকে, যার দ্বারা সবাইকে একসাথে মিলিয়ে দিলেন। তাঁর প্রভাবিত প্রেমধর্মে সর্বস্তরের মানুষ খুঁজে পেলেন শান্তি এবং স্বস্তি। মানুষ দেবতাকে প্রিয় করলো, আর প্রিয়ই হল দেবতা। এই মহামানব শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় পড়লো। চৈতন্যদেবকে নিয়ে লেখা হল বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনীকাব্য। মঙ্গলকাব্যের হিংস্রতা দূর হয়ে কোমল রূপ পেল। অনুবাদ সাহিত্য পুষ্ট হল। সেখানে এল ভক্তিরস। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বিস্তার ঘটলো মধুররসের। তত্ত্বকথার সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা গেল মানবিক রসের। তাঁর উদার মানবীয় ধর্মে পুষ্ট হল কীর্তনগান, বাউলগান, শাক্তপদাবলীর আগমনী-বিজয়ার কাহিনী ইত্যাদি। এখান থেকেই রসদ পেয়ে মুসলমান সাহিত্য হয়ে উঠেছে মানবরসে সমৃদ্ধ। চৈতন্যচেতনায় সমাদৃত হয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে। শুধু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেই নয়, চৈতন্যদেবের এই মানবিক রসধারার উপর উনিশ শতকের পাশ্চাত্য নবজাগরণের প্রলেপ দিয়ে বাংলা সাহিত্য পরাধীন বাঙালি জাতির আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনার সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। চৈতন্যচর্চা উনিশ শতকে এক নতুন মাত্রা পেয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় (গদ্য-পদ্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি) প্রবাহিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকার ধারায়ও চৈতন্যচর্চা লক্ষ্য করা যায়। তবে উনিশ শতক, বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকের পত্র-পত্রিকায়ও চৈতন্যদেবকে নিয়ে চর্যা হয়ে চলেছে। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা একুশ শতকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কীভাবে চৈতন্যদেবকে নিয়ে চর্চা হয়ে চলেছে সে বিষয়েই আমরা আলোকপাত করবো।

ভাবতে অবাক লাগে যে মানুষটি কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি অথচ বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ধারায় তাঁকে নিয়ে চর্চা হয়ে চলেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি উনিশ এবং বিশ শতকে বেশ কিছু পত্রিকা চৈতন্যচর্চাকেন্দ্রিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'চৈতন্যকীর্তি কৌমুদি পত্রিকা' থেকে শুরু করে 'বৈষ্ণব পত্রিকা', 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা', 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা', 'গৌরাঙ্গ পত্রিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিশ শতকে আরও বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় চৈতন্যদেবকে নিয়ে চর্যা হয়েছে আমরা সেদিকের আলোচনায় যাচ্ছি না। একুশ শতকে যে সব পত্র-পত্রিকায় চৈতন্যদেবকে নিয়ে চর্যা

বিশ্বাস, শ্রীবাস : একুশ শতকের বাংলা পত্র-পত্রিকায় চৈতন্যচর্চা
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 1, June 2020, Page : 51-59, ISSN 2249-4332

হয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই আসা যাক ২০০৭ এর ১৪ই জুলাই সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত ড. বারীন রায়ের লেখা নিবন্ধের কথায়। নিবন্ধের শিরোনাম ছিল 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় হঠাৎ রথের চাকা স্তব্ধ হয়েছিল কেন?' এরই উত্তর খুঁজতে উঠে এসেছে শ্রীচৈতন্য প্রসঙ্গ। কারও হাতে রথ না চললেও শেষপর্যন্ত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হস্তক্ষেপে রথ চলেছে। শ্রীচৈতন্যের এই লীলা দর্শনকে লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন—যার মধ্যে দারুব্রহ্ম জগন্নাথের অথবা চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকট হল। চৈতন্যদেব যে একজন মহামানব সেকথাই লেখক আমাদের নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

'দশদিশি' সাহিত্য পত্রিকার 'শ্রীচৈতন্য' সংখ্যায় (জুলাই ২০০৯) আছে ঊনচল্লিশটি প্রবন্ধ, চারটি কবিতা এবং দুটি গল্প। সঙ্গে আছে বিবিধ প্রসঙ্গ। পত্রিকাটি সম্পর্কে দৈনিক স্টেটম্যান এর মন্তব্য—এই পত্রিকাটির 'শ্রীচৈতন্য' সংখ্যা এককথায় অসাধারণ হয়েছে। হোসেনুর রহমান-এর কাছে চৈতন্যদেব হয়ে উঠেছেন হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার প্রতীক। তার মতে হরিদাস না হলে চৈতন্য হতেন না, চৈতন্য না থাকলে হরিদাসের জীবন ব্যর্থ হয়ে যেত। চেনা কথা জানা বিষয় হলেও এভাবে আমরা চৈতন্য প্রেম-ভাবনার ব্যাপ্তির কথা আগে শুনিনি যা হোসেনুর রহমান তার প্রবন্ধে (শ্রীচৈতন্যদেব হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনার প্রতীক) দেখিয়েছেন।

চৈতন্য সংখ্যায় উল্লেখিত শান্তিরঞ্জন দেব-এর প্রবন্ধটি ('চৈতন্যচর্চা : নানাভাবে') খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নতুনত্ব বা বিষয়ের গভীরতার নিরীখে নয়, তিনি যে সূত্রাকারে চৈতন্যচর্চার বিভিন্ন দিকের কথা উল্লেখ করেছেন তা পরবর্তীতে অনেককেই উদ্বুদ্ধ করবে বিস্তারিত ভাবার ক্ষেত্রে। প্রাবন্ধিক নিজেই তার প্রবন্ধের শেষ লাইনে বলেছেন—আমি শুধু বহুবিচিত্রভাবে চৈনত্যচর্চার ইঙ্গিতমাত্র দিলাম। সাহিত্যই তাই বাংলা ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় চৈতন্যচর্চার কথা উল্লেখ আছে। বাংলার চিত্রে-শিল্পে (কাষ্ঠ, মৃৎ ইত্যাদি), লোকগানে এমনকি প্রাত্যাহিক জীবনাচরণেও চৈতন্যসংস্কৃতি বিদ্যমান।

পত্রিকার 'চৈতন্য' সংখ্যার মধ্যে দুটি গল্পের উল্লেখ আছে যার মধ্যে একটি গৌতম ঘোষের লেখা 'সন্ধিক্ষণ' আর একটি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের 'পৌর্ণমাসী'। সন্ধিক্ষণ গল্পে স্বল্প পরিসরের মধ্যে উঠে এসেছে নবদ্বীপের সমকালীন সামাজিক অবস্থা, নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণ এবং তাঁর নীলাচলে যাত্রার কথা। গল্পে নিমাই পণ্ডিত সমাজের শূদ্র-চন্ডাল-যবন সব নীচু জাতির লোকজনদের কানে মন্ত্র দিয়ে ব্রাহ্মণ বানাচ্ছেন। সমাজপতিরা তা দেখে জ্বলে-পুড়ে ওঠেন এবং নিমাই পণ্ডিতকে নবদ্বীপ ছাড়া করার জন্য ছাত্রদের নিমাইয়ের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে চান। শেষপর্যন্ত শচীমাতা এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভয় দেখিয়ে নিমাইকে তাড়াতে যান। কিন্তু নিমাইয়ের বাড়ি গিয়ে জানতে পারেন নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছেন। এতে সমাজপতিদের যুক্তি—সন্ন্যাস নিলে হঠাৎ কেউ আক্রমন করবে না বলেই অকালে সন্ন্যাস নিয়েছেন তিনি (পৃ. ৪৬৯) এভাবে কখনও যুক্তির মধ্যে দিয়ে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন গল্পকার। গল্পের শেষে দেখা যায় মায়ের কথা মতো চৈতন্য নদীপথে নীলাচল যাত্রা করলেন। তাতে অদ্বৈতাচার্যের মনে প্রশ্ন জাগে ভক্তি আন্দোলন কীভাবে চলবে? কেই বা সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন সে ব্যাপারে তো কোনো নির্দেশ দিয়ে গেলেন না? তবে লেখক পত্রিকার ধারায় বর্তমান সমাজ জটিলতার মধ্যে চৈতন্যজীবন কথাকে এনে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন সমাজ গঠনের বার্তা দিলেন।

'পৌর্ণমাসী' গল্পে নারী মনের অন্তর বেদনার কথা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি নারী যে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী এবং সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা ও যে সমান সেকথা নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে গল্পকার তুলে ধরেছেন। নিমাইয়ের সন্ন্যাস নেবার পর নিত্যানন্দ মাতা শচীদেবীকে শান্তিপুরে নিয়ে আসেন সাক্ষাতের জন্য। বিষ্ণুপ্রিয়া সেখানে বঞ্চিতা। এর বছর সাতেক পর শ্রীচৈতন্য নিজেই নবদ্বীপে আসেন মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এ সাক্ষাৎ বাড়ির বাইরে। বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তরাল থেকে সব দেখছেন কিন্তু তাঁর মনের মানুষ একবারও গৃহের মধ্যে এলেন না। শেষে বিষ্ণুপ্রিয়া মনস্থির করে অবগুণ্ঠনে মুখায়ব আচ্ছাদিত করে শ্রীচৈতন্যের সামনে গেলেন। মহাপ্রভু কণ্ঠস্বরেই চিনতে পারলেন এবং বললেন—আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি। দেবার মতো আমার কিছুই নেই-ও। আর পোড়া চোখে জল আসে চৈতন্যদেব আবার বললেন—আমার পর বৈষ্ণব গোষ্ঠীগুলির একতা-বিধানের ভার তোমাকেই নিতে হবে। তার উত্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া

বললেন—কিন্তু আমি কি এত গুরুভার বহনের যোগ্য? কেন নয়? তুমি পৌর্ণমাসী। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে যিনি কৃষ্ণলীলা ঘটান, সেই যোগমায়াই পৌর্ণমাসী। ভগবান কৃষ্ণ তাঁর আনন্দ আস্বাদনের জন্য রাধিকা সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনই আমারও তুমি। তোমার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব তুমি পালন কর। আমি একাকী তো সম্পূর্ণ নই বিষ্ণুপ্রিয়া। আধুনিক সমাজজীবনে নারী-পুরুষের যৌথ প্রয়াসেই যে সমাজের মঙ্গল বিধান সম্ভব এই বার্তাই 'পৌর্ণমাসী' গল্পে মুখ্য হয়ে উঠেছে। আর আছে নারী চরিত্রের উত্থানের কথা।

চৈতন্যদেব নিজেকে যুগে যুগে প্রতিষ্ঠা করেছেন সেকথাই 'মিলেমিশে' পত্রিকার (ষষ্ঠ বর্ষ, ঊনসত্তরতম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১০) 'চৈতন্যস্মরণ'-এ স্থান পেয়েছে। একবিংশ শতকেও যে শ্রীচৈতন্য অপ্রাসঙ্গিক নয় সেকথাই প্রবন্ধ ও কবিতায় বিদ্যমান। অরুণকুমার বসু তার 'ও অকূলের কূল ও অগতির গতি' প্রবন্ধে চৈতন্যদেব সম্পর্কে রবীন্দ্র-ভাবনাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। যার মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধ্যসাধনতত্ত্ব থেকে যত দূরেই রবীন্দ্রনাথের অবস্থান হোক, চৈতন্যসংস্কৃতির আসনতলের মাটির পরে তাঁর প্রণামটি তিনি সবিনয়ে নিবেদন করে গেছেন। আর অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রীচৈতন্য ও সংগীত' নামক বিশেষ রচনায় হরে কৃষ্ণ হরে রাম ... এর মহিমার কথা বলেছেন। এই ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষরের মধ্যেই যেন চিরদিনের সঙ্গীতের কথা বলা আছে। শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীচৈতন্য সঙ্গীতে এবং সংস্কৃতি চর্চায় যেভাবে বিষয় হয়ে উঠতে পেরেছেন আর বোধহয় কেউ পারেননি। সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারায় শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত কীর্তনের ধারা আজও প্রসারিত হয়ে চলেছে। লেখক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় সে কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শ্রীচৈতন্য কি অধ্যাত্মবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক, নব বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক? এসব প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যাবে 'চৈতন্যস্মরণে'। পাওয়া যাবে শ্রীচৈতন্য কি সেকালের, নাকি পোস্টমডার্ণ এসব প্রশ্নের উত্তরও। আসলে চৈতন্যদেব যে প্রেমকথা-শিক্ষা-দর্শন তার প্রাসঙ্গিকতা এত বছর পরেও কমেনি বরং বেড়েছে। শুষ্ক শাস্ত্রপাঠ ও পাণ্ডিত্যের চেয়েও অন্তরের উপলব্ধি এবং শুদ্ধ ভক্তির মূল্য যে বেশি সেই শিক্ষাই তিনি দিয়েছিলেন। তবে শ্রীচৈতন্যের পথকে শুধুমাত্র ভক্তির পথ বললে ভুল হবে কারণ চৈতন্য ধর্মের মূল কথাই হল প্রেম, যা ভক্তিরও উপরে তা ভক্তিকে অতিক্রম করে ধর্মকে এক নতুন দিগন্তের দিকে নিয়ে যায়, এক নতুন উন্মোচনের সন্ধান দেয়।

একুশ শতকের বাংলা পত্র-পত্রিকার চৈতন্যচর্চাকেন্দ্রিক আলোচনায় উঠে আসে 'নির্ণয়' (৫ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ২০১১) পত্রিকার কথা। সেখানে ড. শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ : নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব'। যার মধ্যে চৈতন্যের প্রেমভাবনার কথা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে অনুরণিত হয়েছে। এক সময় রামকৃষ্ণের ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা হয়। কোনো ঔষুধে কাজ হয় না। সে সময় একজন ভৈরবী ব্রাহ্মণী বুঝতে পারেন এ যন্ত্রনার মূল কারণ। যা আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গে ঈশ্বর দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় এই জাতীয় অবস্থা ঘটে। ভক্তি শাস্ত্রে একে বলা হয় মহাভাব। যা দেখা দিয়েছিল শ্রীচৈতন্যের জীবনে। এই মহাভাব ভৈরবীর চোখে ধরা পড়েছিল রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে গৌরাঙ্গ ভাব এসেছিল তা ঠাকুর নিজেই বলেছেন—আবার কখনও গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন-পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন। ঠাকুরের ভক্তরা বরাবরই অনুভব করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যের মধ্যেকার মিলটুকু। আবার দেখা যায় মহাপ্রভু যে কারণে আবির্ভাব তার একটি হল নামপ্রেম বিতরণ করা। এই নামপ্রেম বিতরণ করার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। আচন্ডালে সবার মধ্যে এই প্রেম বিতরণ করেছেন। এরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও। তাঁর মহার্ঘ বাণী 'যত মত তত পথ'। সবাই তাতে স্থান পেয়েছে। আর একটা কথা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব চৈতন্যদেব সম্পর্কে বলেছেন—চৈতন্য ভক্তির অবতার, জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন। মহাভাবের তীব্রতার জন্য (বাহ্যজ্ঞান যখন হারিয়ে ফেলতেন) নামপ্রচারে বাধা আসে। তার জন্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের উপর নাম প্রচারের ভার অর্পণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের কথা মতো নিত্যানন্দ গৌড়ে হরিনামের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। তাই তো মহাপ্রভু নিজেই বলেছিলেন—'মোর হৈতে মোর নিত্যানন্দ দেহ বড়।' অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ সত্তায় চৈতন্য হলেও

ভক্তিধর্ম প্রচারেও নিজেই ছিলেন নিত্যানন্দ। এই অর্থে ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভুই—যাঁর প্রকাশ নিত্যানন্দ প্রভুর 'খোলে'।

দীপঙ্কর বাগচীর লেখা 'কীর্তন' (একদিন নবপত্রিকা-য় ১১ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, ২০১১ প্রকাশিত) নামক প্রচ্ছদ কাহিনীতে কীর্তনের ধারা আজও কীভাবে গ্রাম-বাংলায় প্রসারিত হয়ে চলেছে এবং নিয়মিত বিভিন্ন মন্দিরে, আখড়ায়, আসরে সংকীর্তন হয় লেখক তার উল্লেখ করেছেন। আসলে বাংলাদেশ গানের দেশ আর সেই দেশে ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হল কীর্তন। চৈতন্যদেব বাঙালী সমাজে যে প্রেম ভক্তির জোয়ার এনেছিলেন এবং সমস্ত ধর্মমত নির্বিশেষে ভেদাভেদ দূর করে বাঙালি সমাজের সবাইকে একত্র করার চেষ্টা করেছিলেন তার মূলে ছিল এই সংকীর্তন। এই সংকীর্তন হল সমবেত গান-যেখানে ঈশ্বরের নাম যশ গুণ অনেকে মিলে প্রকাশ্যে গায়। নাম সংকীর্তন আসলে প্রেম-ভক্তি-সাধন সেখানে ছোটো-বড়ো, ধনী-গরীব, গুণবান, গুণহীনের কোনো ভেদাভেদ নেই। সবাই স্বচ্ছন্দে কীর্তনে যোগ দিয়ে ভক্তি সাধনে নাচ-গান করতে পারে। শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলাদেশে ভক্তিধর্মের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু কীর্তনের মূল ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হয়নি।

শ্রীচৈতন্যের আগেও ভক্তজন কীর্তন গান করতেন। কারণ দেবতার নামগান বা স্তুতিগান করার রেওয়াজ ভারতীয় সংস্কৃতিতে খুবই প্রাচীন। তবে ঐতিহাসিকেরা বলেন, নির্দিষ্ট নিয়মিত সাধন পদ্ধতি হিসেবে কীর্তনের প্রতিষ্ঠা বোধ হয় ভক্তিধর্ম প্রসারের সঙ্গে হয়েছিল। নবদ্বীপে বৈষ্ণবগোষ্ঠীর কীর্তনের মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য ছিল তা শ্রীচৈতন্যের কীর্তন গানেও দেখা যায়। তবুও চৈতন্যজীবনীকারেরা বলেছেন শ্রীচৈতন্যই সংকীর্তনের স্রষ্টা ও প্রবর্তক।

পরবর্তীকালে চৈতন্যসম্প্রদায় শাস্ত্রের বেড়াজালে বাঁধা পড়লেও সংকীর্তনের বা সম্মেলক গানের প্রভাব বা আকর্ষণ এতটুকুও কমেনি। আজও বৈষ্ণব গোষ্ঠীতে কীর্তনের ধারা অব্যাহত। সেখানে বিভিন্ন জাতের লোক একত্রিত হয়। এমনকি আজকের দিনের ব্যান্ডের গানের মধ্যেও যেন অনেকটা সম্মেলক গানের ঐতিহ্যের পথ চলাকে দেখতে পাওয়া যায়। যাইহোক ভক্তির আবেগে ও প্রেমের খোঁজে যে কীর্তন একদিন হয়ে উঠেছিল আচন্ডাল সবার মিলনের জায়গা, যার মধ্যে ছিল মানুষের বিশ্বাস আর অন্তঃনিহিত ছন্দ, যা প্রচার করেছিল সাম্যের বাণী সেই ধারা আজও প্রবহমান।

১০ই মার্চ ২০১২ সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত প্রচ্ছদ নিবন্ধে প্রকাশ শ্রীচৈতন্যদেব হঠাৎ হারিয়ে গেলেন কীভাবে? তাঁর অন্তর্ধান ঘিরে রহস্যের সমাধান আজও হয়নি। গবেষকরা এ নিয়ে নানা মত পোষণ করে থাকেন। বৈষ্ণবধর্মের লোকেরা মনে করেন ভাবোন্মাদ শ্রীচৈতন্য প্রভু জগন্নাথের বিগ্রহে বিলীন হয়েছিলেন। আর ইতিহাসবিদরা এমত মানতে রাজি নন। তাঁদের বক্তব্য শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সহচরদের জাতিভেদ বিরোধী প্রচার ও ক্রিয়াকর্ম একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী পুরোহিত সম্প্রদায়কে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তাদেরই ঘৃণ্য চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য। আসল ঘটনা কী? সেই বিষয়েই অনুসন্ধানমূলক আলোকপাত করেছেন শিবশংকর ভারতী—'শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব রহস্য' নিবন্ধে এবং সুমন গুপ্ত তাঁর 'শ্রীচৈতন্যদেবের দেহ পাওয়া যায়নি কেন?' প্রচ্ছদ নিবন্ধে।

শিবশংকর ভারতী মহাশয় শ্রীচৈতন্যে অন্তর্ধানের স্থান ও কাল নিয়ে নানা জনের নানা মত পরিবেশন করেছেন। স্থান সম্পর্কে—(i) জগন্নাথ মন্দির বলেছেন—অচ্যুতানন্দ, দিবাকর দাস, ঈশ্বরদাম, ঈশান নাগর, (ii) গুণ্ডিচা বাড়ি—একথা লোচনদাসের, (iii) টোটা (গোপীনাথ) বলেছেন জয়ানন্দ, (iv) গোপীনাথের মন্দির—নরহরি ও সদানন্দর কথা, (v) সমুদ্রতীরে কুটীর—বলেছেন গোবিন্দ। আর সময় সম্পর্কে বলেছেন—ক) বৈশাখ মাস, সন্ধ্যা, খ) বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া—ঈশ্বরদাসের, গ) আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমী রাত দশটা—বলেছেন জয়ানন্দ, ঘ) আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীর রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহর—লোচনদাসের কথা, ঙ) ফাল্গুনী পূর্ণিমা, সন্ধ্যাবেলা—বলেছেন গোবিন্দ।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের কারণ নিয়ে পত্রিকায় অনেক কথাই উঠে এসেছে। কখনও—(i) জগন্নাথের দেহে লীন, প্রতাপরুদ্রের উপস্থিতিতে বলেছেন অচ্যুতানন্দ। (ii) সবার অলক্ষে জগন্নাথবিগ্রহে বিলীন হওয়ার কথা—দিবাকর দাস বলেছেন। (iii) ঈশ্বর দাস বলেছেন জগন্নাথের হাঁ-করা মুখের মধ্যে অদৃশ্য হন। (iv) জয়ানন্দ বলেছেন—বাম পায়ে মারাত্মক আঘাতের ফলে মৃত্যু। (v) লোচনদাস বলেছেন গুন্ডিচা মন্দিরে অদৃশ্য হওয়া এবং জগন্নাথ অঙ্গে লীন হওয়া।

(vi) ঈশান নাগর মনে করেন জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে অদৃশ্য হওয়া। (vii) ভক্ত অনুগামীরা কেউ কেউ মনে করেন সমুদ্র তীরে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো অন্তর্ধান একথা বলেছেন গোবিন্দ।

শিবশংকর ভারতী এত কথা বলার পর একটা বড়ো প্রশ্ন তুলে ধরেছেন—শ্রীচৈতন্যের প্রায় প্রতিটি পার্ষদের দেহ অতি যত্নে সমাহিত হয়েছে। এমনকি সেই সমধির উপর মন্দির তুলে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কে একথা খাটে না। তবে লেখক যত কথাই বলুন না কেন শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান আজও দুর্বোধ্যেতার মধ্যেই রয়ে গেছে।

সুমন গুপ্তের প্রবন্ধের (শ্রীচৈতন্যের দেহ পাওয়া যায়নি কেন?) শিরোনামের মধ্যেই যেন একটা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তিনিও নতুন কথা বিশেষ বলেননি পূর্ববর্তী আলোচনা পুনরাবৃত্তিই ঘটেছে বলা যায়। তবে এটা তার ক্ষেত্রেই নয়, যারা এ বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন তাদের সবার আলোচনার মধ্যে প্রায় একই ধরনের কথা বলা হয়েছে। তবে সুমন গুপ্ত ধর্মীয় ভাবাবেগকে সম্মান দিয়েও একটা যুক্তি গ্রাহ্য উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন যার মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে গুপ্ত হত্যার ব্যাপারটাই বড়ো হয়ে উঠেছে যা যুক্তি গ্রাহ্য।

প্রাবন্ধিকদ্বয় শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান নিয়ে যাই বলুন না কেন এ আলোচনায় হয়তো ইতি পড়বে না কারণ যুক্তিবাদী মানুষের মনে কোনোদিন জগন্নাথের দেহে শ্রীচৈতন্যের লীন হয়ে যাওয়ার বিষয়টা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততোদিন এ বিতর্ক হয়তো থেকেই যাবে।

২৪শে আগষ্ট ২০১৩ প্রকাশিত সাপ্তাহিত বর্তমান পত্রিকায় স্বামী বেদানন্দ লিখেছেন—'কৃষ্ণনামে মানুষ মাতোয়ারা কেন?' শিরোনামে। প্রশ্ন যেমন রেখেছেন উত্তরও তেমনি দিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমধারা কীভাবে শ্রীরাধা এবং মহাপ্রভুর মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হয়েছে তা তুলে ধরেছেন। আর হরিনাম যে চিত্তকে শুদ্ধ করে মনকে প্রেমদান করে তাও লেখক জানিয়েছেন। ভাগবতে লেখা আছে—'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মানিবেদনম্।।' অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণু বা কৃষ্ণের কথা শুনে, সংকীর্তন করে সেবা করে, অর্চনা করে, বন্দনা করে এবং তাকে প্রভু ও সখা ভেবে এবং নিজেকে দাস মনে করে—তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করলেই ভগবানে ভক্তি লাভ হয়। আর তা পাওয়ার উপায় প্রসঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বলেছেন—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। / অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়া সদা হরিঃ।।' অর্থাৎ যিনি নিত্য কৃষ্ণনাম নিয়ে অন্তরে প্রেমকে পেতে চান তাকে তৃণের চেয়েও অবনত, বৃক্ষ হতেও সহিষ্ণু হতে হবে এবং নিজে অভিমান ত্যাগ করে মানহীনকে মান দিতে হবে, সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। আর কেবল এই ভাবেই হরিনাম ফলপ্রসু হবে। অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের মহাউচ্ছ্বাস ফুটে উঠবে।

মহাপ্রভু বলেছেন—যিনি নিরন্তর মুখে কৃষ্ণনাম করেন তিনি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। তাই তোমরা হরিনাম করো। একমাত্র হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যে দিয়েই ভগবত বিশ্বাস দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। নামের অতুলনীয় শক্তিতে দেহে স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে ওঠে। মনে সর্বদা আনন্দ বজায় থাকে এবং দিনে দিনে জীবনটাও শাশ্বত সুন্দর হয়ে যায়। হরিনামের দিব্য শক্তি মানুষের দেহ ধর্মের জৈবভাবকে চিরতরে নির্মূল করে দেয়। নামের মহিমায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, চিন্তা, রোগ, শোক ব্যাধি ইত্যাদি দূরে পলায়ন করে। তাই কলিযুগে গৌর-নিতাই একযোগে ঘোষণা করলেন—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।' এই নামের শক্তি চঞ্চল মনকে ধীরে ধীরে বশীভূত করে। অন্তরে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করে। এই অনুরাগই হল প্রেম। এভাবে অন্তরে কৃষ্ণ প্রেম জাগ্রত হলে হরিনাম মিষ্টি লাগে। তখন মানুষ সব ভুলে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়।

'দশদিশি' সাহিত্য পত্রিকার 'শ্রীচৈতন্য' প্রথম পর্ব প্রকাশের ছয় বছর পর 'শ্রীচৈতন্য' দ্বিতীয় পর্ব (২০১৫) প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে সম্পাদক মহাশয় চৈতন্যচর্চার প্রাসঙ্গিকতা ও ভবিষ্যৎ সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত করেছেন। এতে স্থান পেয়েছে ছাব্বিশটি প্রবন্ধ এবং বিবিধ সংগ্রহ (পনেরটি)। বিষয় বৈচিত্র্যে সংখ্যাটি অসাধারণ। তবে প্রথম সংখ্যার মত দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাঠকের কাছে গ্রহণীয় কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন চিহ্ন আছে। তথাপি কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ না করলেই নয়।

রথিন চক্রবর্তী 'চৈতন্যচর্চার আর এক দিক' আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তার মতে শ্রীচৈতন্যকে বুঝতে অতি

বিপ্লবী সমাজ সংস্কারকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার দরকার নেই। দরকার নেই ভক্তিগদগদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিতেও। তবে একথা স্বীকার করতেই হয় বাংলার যে উদার ও সহনশীল মনোভাব এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীমুক্তমন তা বাঙালী অনেকখানি পেয়েছিল শ্রীচৈতন্যের কাছ থেকে। বাংলার যে হিন্দু সমাজ বা হিন্দু আদর্শে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো কখনই পরধর্মকে বিদ্বেষ করে না তার পেছনেও রয়েছে চৈতন্যপ্রভাব।

বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ যে নানা সময়ে হয়ে উঠেছে কীর্তনেরই যোগ্যস্থান তার মূলে শ্রীচৈতন্য—একথা তাপস বসু উল্লেখ করেছেন তার 'শ্রীচৈতন্য এবং বাংলার কীর্তনগান' নিবন্ধে। কীর্তনে প্রকার ব্যাপ্তি লেখকের কলমে অন্যমাত্রা পেয়েছে।

'চৈতন্য-আন্দোলনে নারী' শিরোনামে লেখা মধুশ্রী মুখার্জি-র লেখাটা উল্লেখের দাবী রাখে। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে নারীর অবদান অপরিসীম। তারা শুধু বৈষ্ণব গৃহিনী নন, তাদের ত্যাগ-আদর্শ-সেবা পুরুষের পাশাপাশি অগ্রনী করে তুলেছে। শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলনে অনেকেই (জাহ্নবাদেবী, সীতাদেবী, হেমলতা প্রমুখরা) স্ত্রী-গুরু রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

আরও কিছু নিবন্ধ উল্লেখের দাবি রাখে বটে কিন্তু নতুনত্ব খুব বেশি নেই। শেষে বলতে হয় বিষয়-বৈচিত্র্যে, পরিপাটিতে পত্রিকাটি ভালো হলেও আগের সংখ্যার মতো জনপ্রিয়তা পায়নি। হয়তো অনেক প্রবন্ধের শিরোনাম পাল্টেছে কিন্তু নতুন করে কিছু পাওয়া যায় না।

নবদ্বীপে সর্বপ্রথম অভিনব সংকীর্তনের ধ্বনি ওঠে শ্রীবাস অঙ্গনে। সে সময় সমাজের বহু লোক চাঁদকাজীর কাছে এই সংকীর্তনের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন। চাঁদকাজীর কাছে বাধা পেলেও শেষপর্যন্ত সংকীর্তন নামক মহা অস্ত্রের দ্বারাই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং কাজীদলন করলেন। উদ্ধার করলেন জগাই-মাধাইকে। নানা জনকল্যাণমূলক কাজ করতেন। সংকীর্তন-পিতা গৌরাঙ্গই এর মূলে। গৌরহরির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ 'মাতৃশক্তি' (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০১৫, পত্রিকায় ১৪ বর্ষ, ৬ষ্ঠসংখ্যায়) প্রকাশিত হয় 'গৌরমঙ্গল' যার মধ্যে আছে জ্যোতির্ময় নন্দের লেখা কবিতা 'এসো হে গৌরচন্দ্র'। চল্লিশ চরণে লেখা কবিতায় যেন মহাপ্রভুর জীবনের সবকিছু ধরা পড়েছে।

গুরুপ্রসাদ মহান্তি লিখলেন 'সংকীর্তন-পিতা শ্রীগৌরহরি'। সংকীর্তন আগেও ছিল কিন্তু তাকে ঠিক সংকীর্তন বলা যায় না। হিন্দুধর্মের প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নামকীর্তনসহ শোভাযাত্রাদি হয়। গীতায় 'জপযজ্ঞ'-এর উল্লেখ আছে। ভাগবত, মহাভারতেও কীর্তনের গুণগান আছে। শাস্ত্রে নানাভাবে সংকীর্তনের কথা থাকলেও প্রচারের আলোয় আনলেন বঙ্গতনয় শ্রীগৌরাঙ্গ। আর এই অভিনব কাজটি শ্রীবাসের অঙ্গনেই সৃষ্টি করলেন। এভাবেই তিনি হয়ে উঠলেন সংকীর্তনের পিতা। সেই পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে একে একে আমরা পেয়ে যাই যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে। শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি সবসময় কীর্তনের কথা বলতেন। তাছাড়া 'শ্যামসঙ্গীত প্রভৃতি যা যা গীত হয়, তাও তো কীর্তনই।' বিজয়কৃষ্ণ বিশ্বাস করতেন এবং বলতেন ভগবানের বহু অবতারের মধ্যে অবতার সার গোরা অবতার। বিজয়কৃষ্ণের পাশাপাশি কেশবচন্দ্রকেও আমরা পাই। মোটকথা গৌরাঙ্গ কোনো গ্রন্থ লিখলেন না শুধু নাম বিলোলেন। তাতেই হয়ে উঠলেন সংকীর্তন পিতা।

পত্রিকায় বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'মহাপ্রভুর মহাজীবন' নামক শিরোনামে। যার মধ্যে সত্তরটি ছোটো ছোটো শিরোনামে মহাপ্রভুর পরিপূর্ণ মহাজীবন কথাকে ধরতে চেয়েছেন। চেয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের একটা ছবি আঁকতে। কিন্তু শেষে দেখলেন তা হয়েছে একটা ছোটো ক্যানভাস। কারণ শ্রীচৈতন্যের মতো অত বড়মাপের মানুষকে এত ছোটো ক্যানভাসে আঁকা যায় না, ধরা যায় না, তাইতো তিনি মহাপ্রভু।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'নিমাই-গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসদীক্ষা' রচনায় নিমাইয়ের প্রতিজ্ঞার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি কীভাবে প্রতিটি জীবের হৃদয় দ্রবীভূত করবেন সেকথা লেখক তুলে ধরেছেন। আর পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—'শ্রীচৈতন্য প্রভাবে আদিবাসী সমাজ' যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে শ্রীচৈতন্যের উদারতা। নিম্নবর্গের মানুষ এতকাল দেবতার আরাধনার সুযোগ পায়নি। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে মানুষ এই অধিকার পেয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য দক্ষিণভারত

থেকে মধ্যভারত হয়ে উত্তরভারত যাত্রাকালে শুধুমাত্র রাজপদ দিয়েই যাত্রা করেননি যখন ঝাড়খণ্ড-বিহার-সাঁওতাল পরগণা দিয়ে গেছেন, সেখানে আদিবাসী কোল-ভীল-মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের মনের মধ্যে ধর্মের ভাব ও চিন্তার প্রসার ঘটিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য প্রেমধর্মের দ্বারা মানুষের মনের মধ্যে চিন্তার-চেতনার-আধ্যাত্মিকতার যে বিকাশ ঘটালেন তাতে তা ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সর্বশ্রেষ্ঠ সোপান হয়ে উঠেছিল।

সাপ্তাহিক বর্তমান (১৯ মার্চ ২০১৬) পত্রিকায় 'শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী, না হিন্দু-বিপ্লবী?' এই প্রশ্নকে সামনে রেখে প্রচ্ছদ নিবন্ধে কলম ধরেছেন তিনজন—অচিন্ত্য বিশ্বাস, সুদেষ্ণা ধর এবং ড. তাপস বসু। 'সংক্রান্তির সন্নিপাত' (মহাপ্রভুর চরিত কথা : ভিন্ন চোখে) নিবন্ধে অচিন্ত্য বিশ্বাস ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে নেতৃত্বহীন হিন্দুসমাজকে কীভাবে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণনাম সম্বল করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করলেন সেকথা তুলে ধরেছেন। যেখানে একজন বিপ্লবীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সন্ন্যাসীর বেশে। সুদেষ্ণা ধর এর লেখায় (শ্রীচৈতন্যদেব কাকে কাকে ষড়ভুজ রূপ দেখিয়েছিলেন) ধরা পড়েছে কীভাবে পাণ্ডিত্যের অহংকার চূর্ণ হয় সেকথা। একই সঙ্গে উঠে এসেছে শুষ্ক জমি শ্রীচৈতন্য প্রেমফসলে কীভাবে ভরে উঠেছে।

ড. তাপস বসু লিখেছেন 'বৃন্দাবনে দোল উৎসবের উন্মেষ এবং ক্রমপরম্পরায় তার প্রসার' শিরোনামে। এখানে রাধা-কৃষ্ণের মধুরলীলার সবটুকুই বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করে। কখনও তাঁরা যমুনাতটে, কখনও বা সংকেতকুঞ্জে, কখনও নিধুবনে অবস্থান করেছেন। লেখকের ভাবনায় রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার সঙ্গে চৈতন্য প্রেমকথা কীভাবে দোল উৎসবের মধ্যে দিয়ে আজও প্রসারিত হয়ে চলেছে এবং আজও আমাদের মর্মে-কর্মে স্পর্শ লাগে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেহেতু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব লগ্নটি ফাল্গুনী পূর্ণিমার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবেই সংলগ্ন। শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব দোলের দিনটিকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তো বটেই, সাধারণ মানুষের কাছে তা পরম রমণীয়। সাহেবী আমল থেকে কোলকাতার অভিজাত হিন্দুদের গৃহে কৃষ্ণচর্চা, রাধাকৃষ্ণের ভজন-পূজন ছাড়াও সারা বছর নানা উৎসব লেগে থাকতো। তার মধ্যে দোলের আয়োজন, উল্লাস আনন্দ ছিল বহুমুখী। আজকের দিনে শান্তিনিকেতনের দোল-উৎসব বা বসন্ত উৎসব নামে বিখ্যাত। সব মিলিয়ে লেখকের এই ভাবনা একটি অনন্য সংযোজন বলতে পারি।

সাপ্তাহিক বর্তমান ৮ জুলাই ২০১৭ সংখ্যায় একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছেন কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত। শিরোনাম—'ছয় গোঁসাই কি শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম রক্ষা করলেন?' এরই উত্তর খুঁজতে আমরা প্রবন্ধটির পর্যালোচনা করবো। আসলে বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের নামের পাশাপাশি ছয় গোঁসাই-এর নাম উচ্চারিত হয়। এঁরা শ্রীচৈতন্যের টানে বাড়ি-ঘর-সংসার-পরিজন ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে আসেন। ভক্তি প্রচারের কাজ করেছিলেন রূপ-সনাতন। বাকি চারজন হলেন জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস এবং রঘুনাথ ভট্ট। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ ছিল রূপ-সনাতন বৃন্দাবনে লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করবেন, নতুন ভক্তিশাস্ত্র রচনা করবেন, নিঃসহায় বৈষ্ণবদের দেখভাল করবেন। সেই মতো তাঁরা কাজ করে গেছেন।

রূপ-সনাতন এঁরা দুজনেই ছিলেন সুলতান হুসেন শাহের কর্মচারী। একসময় যখন শুনলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে আসছেন। সেখানে গোপনে তাঁরা দুই ভাই প্রভুর সঙ্গে দেখা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথায়—'ঘরে আসি দুই ভাই যুক্তি করিঞা। / প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া।' শ্রীচৈতন্যের আলিঙ্গনে ধন্য হলেন রূপ-সনাতন। প্রভুর নির্দেশ মতো বৃন্দাবনে এসে রূপ লিখলেন—'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব' নাটক। তবে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'ভক্তি রসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি'। হোসেন শাহর অধীনে কাজ করার সময় রূপ লিখেছিলেন 'হংসদূত', 'উদ্ধবসন্দেশ' এবং 'গীতাবলী'। আর সনাতন প্রভুর নির্দেশ মতো প্রেমভক্তিতত্ত্ব নির্ণয় করে লিখে ফেললেন—'বৃহদ্ভাগবতামৃত'। এছাড়া লিখেছেন ভাগবতের দশম স্কন্ধের টিপ্পনী—'বৈষ্ণবতোষণী', লিখেছেন 'হরিভক্তিবিলাস'। গৌড়ে থাকার সময় লেখেন—'তাৎপর্যদীপিকা' নামে একটি টীকা।

রূপ-সনাতনের ছোট ভাই অনুপম এর পুত্র হলেন শ্রীজীব গোস্বামী। তিনি শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম হল ষট সন্দর্ভ। এগুলি হল—(i) তত্ত্ব সন্দর্ভ, (ii) ভগবৎ সন্দর্ভ, (iii) পরমার্থ সন্দর্ভ, (iv)

শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ, (v) ভক্তি সন্দর্ভ এবং (vi) পরমাত্ম সন্দর্ভ। ড. সুকুমার সেন মনে করেন—অজস্র গ্রন্থ রচনা করে জীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব চিন্তাকে নতুন দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কোনোদিন কাউকে দীক্ষা দেননি। তিনি যখন প্রথম পূর্ববঙ্গে যান তখন প্রথম ভক্ত হন তপন মিশ্র। এই তপন মিশ্রের পুত্র ছয় গোঁসাই-এর একজন—রঘুনাথ ভট্ট। ব্যাকরণ-কাব্য-অলংকার শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এই সুকণ্ঠের অধিকারী রঘুনাথ ভট্ট। তিনি মহাপ্রভুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন জগন্নাথের চোদ্দ হাত লম্বা প্রসাদিমালা ও তাম্বুল মহাপ্রসাদ। তাঁর ভাগবত পাঠ সবাইকে মুগ্ধ করতো। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে তিনি বাবা-মায়ের সেবা করতেন। পরে গোবিন্দের সেবায় সবসময় তাঁর জীবন কাটতো।

গোপাল ভট্ট সম্বন্ধে বেশি কথা জানা যায় না। তাঁর গুরু ছিলেন প্রবোধানন্দ। অল্পকালের মধ্যেই গোপাল ভট্ট ব্যাকরণ-কাব্য-অলংকার ও বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। সনাতন তাঁকে দিয়ে 'হরিভক্তিবিলাস' পরিবর্ধিত করিয়ে টীকা লিখিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের টানে যাঁরা ব্যাকুল হয়ে ঘর ছেড়ে চলে এসেছিলেন তাঁরা সবাই অসামান্য দৃঢ় চরিত্রের লোক। রঘুনাথ দাস এই অসামান্যদের মধ্যেও অসামান্য। তাঁর মত কৃচ্ছ্রসাধনার তুলনা ইতিহাসে নেই। মহাপ্রভু তাঁকে বলেছিলেন আমার কথায় যদি বিশ্বাস থাকে তবে এই উপদেশ পালন করিও—'গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্তা না কহিবে / ভাল না খাইবে রঘু ভাল না পরিবে। / অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। / ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।' রঘুনাথ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জীবনের কঠোর বৈরাগ্য ছাড়েননি যা বৈষ্ণব সাহিত্যে আজও ইতিহাস হয়ে আছে। সব মিলিয়ে এই ছয় গোঁসাই শুধু বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থই উদ্ধার করলেন না, বৈষ্ণব ধর্মকে রক্ষা করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করলেন।

দেশ পত্রিকা ২রা মার্চ ২০১৮ সংখ্যায় চৈতন্যদেব সম্পর্কে কলম ধরেছেন তিনজন বিশিষ্ট মানুষ। সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন—'বাঙালির আত্ম জাগরণে শ্রীচৈতন্য', যার মধ্যে দেখা যায় চৈতন্য-প্রেমকথা আজও প্রসারিত হয়ে চলেছে। লেখকের দৃষ্টিতে সবচেয়ে যেটা বড়ো কথা ধরা পড়েছে তা হল গৌরাঙ্গ মন্দিরে থাকেন না, শাস্ত্রে থাকেন না, থাকেন মানুষের হৃদয়ে। শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধানের এতকাল পরেও বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় যে মানুষটির আলোচনা থেকে সরে আসা যায় না সে প্রসঙ্গে তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'চৈতন্যময় বাংলা সাহিত্য'। এর আসল কারণ হল তিনিই আমাদের চেতনা, তিনিই আমাদের বিবেক, তিনিই আমাদের মনুষ্যত্ব। সিজার বাগচী লিখেছেন 'গণনায়ক শ্রীচৈতন্য' শিরোনামে। তার বিশ্লেষণে একদিকে যেমন ধরা পড়েছে গণনায়ক শ্রীচৈতন্যের আন্দোলনে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিকের কথা। অপরদিকে তাঁকে (শ্রীচৈতন্যকে) যে আজও পুরোপুরি আবিষ্কার করা যায়নি সেকথাও লেখক আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে মাঝে মধ্যেই নানারকম লেখা চোখে পড়ে। তার দু-একটি চিত্র আমরা তুলে ধরি। এর মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার নদিয়া পেজে কৃষ্টিকথা-য় মজার মজার নানা অজানা বিষয় তুলে ধরে অনেকেই চৈতন্যচর্চার ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। কাকলি ভৌমিক কৃষ্টিকথা-য় (আনন্দবাজার, ৭ এপ্রিল ২০২০) নদিয়া জেলার চাকদহের জগন্নাথ মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। এই মন্দির গৌড়ীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। চাকদহ শহরের যশড়া পাড়ায় একদা জগদীশ পণ্ডিত বসবাস করতেন। তিনি একসময় মায়াপুরে যান। সেখানে জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা হয়। কথিত আছে শৈশবে নিমাই একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে কোনোভাবে সুস্থ হচ্ছিলেন না। সে সময় চাকদহের যশড়ায় জগদীশ পণ্ডিতের গৃহে নিমাই প্রসাদ গ্রহণ করলে সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই জগদীশ পণ্ডিত স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে যশড়ায় জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পান। তারপর সেখানে জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরে চৈতন্যদেব এসেছিলেন। তাছাড়া নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য দুজনেই এই মন্দিরকে আরও বৃহত্তর করার রূপ দিতে জগদীশ পণ্ডিতকে উৎসাহিত করেছিলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা নদিয়া পেজে ২৯শে মে, ২০২০ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'ষষ্ঠীতে ষাটের বাতাস

পেলেন না মহাপ্রভু' শিরোনামে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে নবদ্বীপের মহাপ্রভু মন্দিরে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে জামাইষষ্ঠী। সারাবছর যাঁকে ধামেশ্বর মহাপ্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে পুজো করা হয়। জামাইষষ্ঠীর দিন তিনিই হয়ে ওঠেন আদরের জামাই। বছরের এই দিন মহাপ্রভু মন্দিরের সেবায়েত গোস্বামীদের জামাই। ঘরের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া। এদিন নবদ্বীপের মানুষ 'ষাটের বাতাস' দিয়ে ছড়া কাটেন। প্রচুর লোকের সমাগম হয়। এবছর করোনার জন্য শুধু নিয়ম রক্ষা করা হয়, সাধারণ মানুষের আশা পূর্ণ হল না। তাই ষষ্ঠীতে ষাটের বাতাস পেলেন না মহাপ্রভু। এরূপ অনেক কথাই আছে যা আমাদের অনেকেরই অজানা।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশত চৌত্রিশ বছর আগে যে মানুষটির আবির্ভাব তাঁকে নিয়ে বর্তমান একুশ শতকেও চর্চা হয়ে চলেছে। আমি কেবলমাত্র সূত্রাকারে এই শতকের কিছুপত্র-পত্রিকায় চৈতন্যচর্চার কথা তুলে ধরলাম। তাঁকে নিয়ে আলোচনার আরও অনেক পরিসর আছে। সবশেষে বলি চৈতন্যচর্চার শেষ নেই। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্য তাঁর সহজ সরল ধর্মাচরণের মধ্যে দিয়ে হরিনাম সংকীর্তনকে হাতিয়ার করে বাঙালী জাতিকে একমন্ত্রে দীক্ষি ত করেছিলেন। শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বন্ধনমুক্তির আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষে ত্রে। আজ একুশ শতকেও সেই ধারা সাহিত্যের অন্যান্য ধারার সঙ্গে পত্র-পত্রিকার মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। পরিবর্তন এসেছে, রুচির বদল হয়েছে, তবুও আমরা চৈতন্য-ভাবনা থেকে সরে আসতে পারিনি। আগের মতো নিষ্ঠা, তমোগ্নতা, গভীরতা, আবেগ এখন আর নেই কিন্তু চৈতন্যচর্চা এখনও হচ্ছে। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন হয়তো এই চর্চার ধারা চলতে থাকবে।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা:

১। শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাত, ২০০৬।
২। অভিতাভ চৌধুরী সম্পাদিত দেশ, ৬ মার্চ ১৯৯৯, কলকাতা।
৩। পান্নালাল ঘোষ সম্পাদিত সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৪ জুলাই ২০০৭, কলকাতা।
৪। দশদিশি সম্পাদকমণ্ডলী, দশদিশি, বিষয় : শ্রীচৈতন্য, নভেম্বর ২০০৯, কলকাতা।
৫। শ্রী সমীরকুমার গুপ্ত সম্পাদিত মিলেমিশে, চৈতন্যস্মরণ, ডিসেম্বর ২০১০, কলকাতা।
৬। তাপসী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, নির্ণয়, চৈতন্য হোক ৫ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা মার্চ, ২০১০, কলকাতা।
৭। একদিন, নবপত্রিকা (কীর্তন), ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১, কলকাতা।
৮। শুভা দত্ত সম্পাদিত, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১০ মার্চ ২০১২, কলকাতা।
৯। শুভা দত্ত সম্পাদিত, সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৪ আগষ্ট, ২০১৩, কলকাতা।
১০। দশদিশি সম্পাদকমণ্ডলী, দশদিশি, বিষয় : শ্রীচৈতন্য (দ্বিতীয় পর্ব), কলকাতা ২০১৪-২০১৫।
১১। কুশল চৌধুরী সম্পাদিত, মাতৃশক্তি (গৌরমঙ্গল) ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৫, কলকাতা।
১২। শুভা দত্ত সম্পাদিত, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৯ মার্চ ২০১৬, কলকাতা।
১৩। শুভা দত্ত সম্পাদিত, সাপ্তাহিক বর্তমান, ৮ জুলাই ২০১৭, কলকাতা।
১৪। সুমন সেনগুপ্ত সম্পাদিত, দেশ, ২ মার্চ ২০১৮, কলকাতা।
১৫। আনন্দবাজার পত্রিকা (নদিয়া) কৃষ্টিকথা, পৃ. ক৪, ১৪ জানুয়ারি ২০২০, কলকাতা।
১৬। আনন্দবাজার পত্রিকা (নদিয়া) কৃষ্টিকথা, পৃ. ক৪, ৭ এপ্রিল ২০২০, কলকাতা।
১৭। আনন্দবাজার পত্রিকা, নদিয়া, পৃ. ৫১, ২৯ মে ২০২০, কলকাতা।

শ্রীবাস বিশ্বাস,
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
পোলবা মহাবিদ্যালয়, পোলবা, হুগলি

Refugee Rehabilitation in Nadia District

Subhas Biswas

India got independence on the 15th of August, 1947. Simultaneously a large part of the Muslim-inhabited region of India was seceded and a separate state came into being– Pakistan by name. In connection with the aforementioned secession, two provinces of India–Bengal and Punjab–were divided. East Bengal and West Punjab were included in Pakistan, West Bengal and East Punjab remained in India. The minority Hindus of East Bengal became refugees and they came pouring into the different adjoining border provinces of India for shelter since the partition of India. The majority of the refugees of East Bengal took shelter in West Bengal. In view of the numerical facts of rehabilitated refugees, Nadia district won the remarkable position in all the districts of West Bengal. The highest population of Nadia district in the recent timesowelargely to the refugee families. This was a big burden for the newly independent India. In spite of that, both the central and the state government had to take necessary steps for their rehabilitation.

At the initial phase the Govt. had no far-reaching plan about the refugee camps and the encamped refugees of Nadia as well as West Bengal. Though the Govt. distributed the relief to the refugees who asked for it, appropriate initiatives were not taken up for their rehabilitation. The relief which was distributed by the Govt. was irregular and insufficient. It is a matter of great surprise that in the year 1948, the Govt. resolved to cease the relief for the male refugee of sound physique and all other members of his family (who have been living in the camp for more than seven days). In the meantime the higher officers of the Govt. visited the refugee camps and they divided the encamped refugees into few categories or classes : (A) The refugee families, who were fit for rehabilitation, were to be sheltered at the temporary camp or the Transit camp; (B) The Refugee families who had male member and whose responsibilities were to be borne for every or long period by the Govt., were to be sheltered at the permanent camp or permanent habitations camp or P.L. camp, (C) The Refugee family, who had only female and infant members, were to be sheltered at the women camp or Guardian less camp or home and infirmaries. According to the said classification the selection of after mentioned categories of refugee was started in the midst of great interment in the different refugee camps of West Bengal including Nadia district.[1]

In the year 1951 the Govt. of West Bengal decided to cease the said transit camps. In the meantime communal repression was started in East Bengal and that is why the speedy migration of the refugees was started a new into West Bengal. As a result the Govt. was compelled to cancel its previous decision in regard to the cessation of the refugee camps. The central Govt. took special case for the Bengali refugees in the year 1955 or afterward. In the medial period

Biswas, Subhas : Refugee Rehabilitation in Nadia District
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 1, June 2020, Page : 60-65, ISSN 2249-4332

of 1947 to 1955 the Govt. of India gave some assistance to the Bengali refugees. By dint of the Banama Project the refugee family was directed to select a piece of land and the Govt. sanctioned the loan to the refuge family after considering the background of the refugees.[2] The Govt. declared the scheme of loan for the rehabilitation of the refugee living both in rural and municipal areas.[3] As a result of the declaration of the aforesaid scheme of loan, many refugee families of Nadia district got the scope of rehabilitation in the rural and municipal areas. But the scope of hiring loan was the fruit of long struggle. There was scarcity of purchasable land though the refugees obtained the scope of having loan after various kinds of struggle. Under such circumstances the Govt. project was partially materialized. Moreover the member of the refugees in Nadia district washuge and that is why very small member of refugee families in Nadia district got the opportunity for rehabilitation. Rest of the refugee families, huge in number, were sent to the different place of outside West Bengal including Dandakaranya and Andaman Islands.

When a huge number of refugees began to take shelter camping from East Bengal indigently, the undivided community party (CPI) supported the demands of the refugees with a view to drawing the refugee vote bank in their favor. Gradually they brought the refugee under the protection of their movement and raised the slogan 'Give rehabilitation', 'Give land' and soon. As a result the then ruling Congress Govt. of West Bengal was pressed and speedily framed an act named 'Permanent Liability Act' which was generally known as PLA. Having brought the refugees from Sealdah and other places on the outskirts of a village where camps were built, those camps were named as permanent liability camp of which was previously discussed.[4] Most of these refugees were sheltered at the camps of Nadia district.[5] Mainly six categories of refugee were sheltered at the said camp : (1) Aged male refugees of above 6o years old and aged female refugees of above 50 years old having no active member in their family, (2) Permanently handicapped and disabled refugees, (3)Women belonging to backward community having no active grown-up sons, (4) Intolerable young boys and girls of below 16 years of age and still unmarried and unemployed and lonely young girls. (5) Dependent of first three classes of refugees and (6) Dependents of the patients of tuberculosis.[6]

It was resolved by the Department of Relief and Rehabilitation of West Bengal in 1957 that a long shaped Relief camps like Cooper's camp of Nadia district should be converted into townships. The preparation was started to effect the said resolution by sending the encamped refugees to the Rehabilitation centers. But after 1951 due to communal riot, introduction of passport system etc. in East Bengal the flux of the refugees filled up the camps of Nadia a new. As a result the situation became unfavorable for cessation of those camps.[7] In the meantime the central Govt. ceased to rehabilitate a large number of refugees of different places including Nadia district at Dandakaranya of Orissa and Madhya Pradesh with the assistance of subsequent 'Permanent Habitation Camp'. Consequently, with the help of the State Govt., 'Permanent Liabilities Camps' of Nadia district continued to run feebly.[8] In 1949 at the Rupashree Pally refugee camp of Ranaghat, which was the first refugee camp of Nadia district,

few initiatives for welfare works were taken up by the then Asset Disposal officer of the camp Jamini Sarkar tried his utmost to transform Rupashree Pally to a industrially developed zone and some progressive refugee families and Govt. employees also tried their level best to materialize the initiative of the said officer. As a result of the said initiative, about 22 kinds of handicrafts like wooden work, artistry with sponge wood, making of conch bangle, iron works, cane work, weaving and soon were introduced. The refugees of Rupashree Pally began to earn something by dint of manual works in those handicrafts. Afterwards, the said project fell flat for want of Govt. assistance.[9]

Dilip Chaki has said that the refugee of Cooper's camp of Ranaghat went to Dhubulia Camp as they could not tolerate the miserable life and extreme disorder in the camp. But they gathered the same experience at Dhubulia camp. One day some refugee families were brought to Taherpur for rehabilitation by lorry. Four to five refugee families lived under the thatch of tin and fenced with reeds. Each family lived detached from other family. It is to be noted here that the rehabilitated refugees of Taherpur got the best opportunity among all the other rehabilitated refugees of Nadia district. In 1951 at least 6000 refugees of Dhubulia, Ranaghat and Chandmari Camps were rehabilitated at Taherpur Colony and thus the beginning of theTaherpur Colony started. Such well arrangement for rehabilitation was not viewed anywhere. In spite of the facilities given at Taherpur Colony poor arrangement for toilet, drinking water, medical treatment etc. was not solved. In the early phase, when one tubewell was arranged for 100 refugee families, lamentation was noticed for the want of water, medicine, doctor etc. Dilip Babu also informed that when the refugee relief center was shifted from Taherpur to Birnagar (situated seven or eight km away), refugees would go to fetch P.L. 480 rice on foot (relief sent from America for refugees).[10]

In the year 1952 the then Rehabilitation Minister of West Bengal Renuka Roy came to visit Taherpur Refugee Colony. She got down at station-less Taherpur from Sealdah by Lalgola Passenger train as the driver stopped the train because of the visit of the minister and went to the Taherpur refugee colony. Shebecame very much surprised to visit a small part of the colony and saw the woeful pictures of misery of the refugees. She expressed her deep sorrow and said, "It is quite unthinkable about the living of human resources through extreme neglect and terrible distress." She brought some clothes for the refugee children and in hot haste distributed the clothing and came back Calcutta by return train. But it is a matter of regret that 1% of her reliefwas not received by the refugee children.[11]

The Govt. planned to establish township for the refugee of Taherpur and distributed 5 coltish of plot for habitation among each of the refugee families of Taherpur. The provision was that the residence and the toilet must be built up by pucca bricks in the proposed township. Every refugee family was given Rs. 400/- in cash at the initial stage for the construction of their residence and later on it was decided that every family would be given Rs. 850/- as per the decision of the Govt. According to the decision of Govt. every refugee family of Taherpur got the financial assistance in various phases.

TABLE : FINANCIAL ASSISTANCE RECEIVED BY THE REFUGEE FAMILIES OF TAHERPUR

Cash given to each refugee family during distribution of residence	Rs. 400/-
Future payment to be made after completion of pucca house	Rs. 850/-
For business purpose	Rs. 750/-
For construction of lavatory	Rs. 250/-
Total	Rs. 2250/-

Most of the newly arrived refugee families of Taherpur did not construct any full-fledged house in East Bengal and they had been living in their ancestral dwellings. As a result they were at a loss to have the guidelines for the construction of pucca house at Taherpur. They did not knowthe exact places where bricks, sands, cements, iron rods etc. would be available. Moreover during summer season non-metalroads became full of knee-deep dusts and in the rainy season the roads become full of knee-deepgluey mud and that is why there was no scope of entry of lorry loaded with bricks and sands in thecolony area. In the mean time some dishonest contractors came to the refugee families with evil intention and assured them that they would construct the houses of the refugees. Believing in the deceitful contractor, the refugees gave them some money as advance. Most of the refugee families gave them the total financial assistance amounting to Rs. 400/- or some money of the Govt. assistance as advance. The fact is that someemployees of the relief centers had good relation with the deceitful contractors and that is why the refugee believed easily that the contractors would surely construct their houses. Ultimately those dishonest contractors neither constructed their housesnor returned their money. Thus many refugees became distraughtand were thrown in an awkward situation. As a result at least 1/3 refugees of Taherper compelled to leave the colony for the pursuit of livelihood in another place. Onesection of therefugees who left the colony returned to East Bengal again and some of them took shelters at the different refugee camps. Again some of them went to Dandakaranya and the rest of the refugees went elsewhere separately.[12]

There was a great problem of the refugees of Nadia district that their demand amountingto Rupees 2,250/- was delivered to them very slowly and step by stepfor the appropriate purpose. In addition to this,their money wastrapped bydeceitful contractors and spoilt.Thus the refugees of every colony in Nadia district including the colony of Taherpur could not use the insignificant relief which they received as the ownership dueto the procrastination of the Govt. If the refugees were duly given the govt. grant at a time and speedily, they might get the benefit of the Govt. assistance.[13] The refugees of Taherpur maintained their livelihood by working in the agricultural field during a particular season, or in a forest of Aranghata in Nadia district, Bahadurpur forest and various places as day laborers or by hawking at footpath, station and in train. Furthermore,the census commissioner came to Nadia in 1964 and became surprised

to see the hard struggle for life of industrious refugees of Nadia district and remarked. "Very industrious refugees have built up many colonies at the prolonged space alongside the railways of Nadia district. They are ready to bring fallow land under cultivation. The villages of Nadia district whichwere situated on the northern border of the industrial area of Calcutta and were small in size and sleeping before 1947have been changed by the refugees."[14]

The aged refugee leader of Taherpur, Dilip Chaki, made an allegation that the refugees were deprived by the Govt. for many years in various ways. Perhaps in the year 1956 the Govt. decided toestablish a spinning mill for the sake of employment of the refugees of Taherpur. The then minister Purabi Mukherjee inaugurated a new pond by striking soil with a spade in order to supply water in the said mill. Two and half a maund cake made of sugar boiled ware distributed for the said purpose. But the Govt. did not perform any earthwork after its inauguration. It was known afterwards that the land where the inauguration ceremonywas performed was not occupied by the Govt. as per the law.

When the local people of Nadia in West Bengal became happy to get the news of liberation of India in the year 1947, being shattered with the poison of the partition of the country, the life of the incoming refugees from East Bengal became enveloped with profound darkness of the new moon. The impact of the partition of India yielded separate results on the lives of the Hindus of East Bengal and West Bengal. –ÉáÓõÉæðBeing pressed with unfortunate situations, the refugees comingfrom East Bengal took shelter at the refugee camps, refugee colonies, foot paths, stations of Nadia district and began to pass their live through wants and neglect and disregard from the most of the local people day by day. Though many Govt.employees of the camp became sympathetic with the refugees, some employees possessedthe opposite mentality. Those miniature employees of the refugee camp of Ranaghat possessed with self-styled mentality? "The said group of miniature employees organized a circle or community in […] female sections. Most of them were refugees but any kind of sympathy was never expected from them except inhuman treatment and disrespect…. About every refugee family was competed to live alone on account of the supremacy of the said section of Govt. employees."[15]

Sources :

1. Harinarayan Adhikary (Ed.), Sangrami Rupashree Palli, 1995, Kolkata, p. 22.
2. Prafulla K. Chakrabarti, The Marginal Men : The Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal, Second Edition, 1999, Naya Udyog, Page-37.
3. Report of the Committee of ministers for the Rehabilitation of Displaced persons in West Bengal, Manager, Government of India Press, Calcutta, 1954.
4. The Relief and Rehabilitation of Displaced persons in West Bengal (Report 1957) defined permanent liability camp as thus: "...Amongst the refugee families that are admitted to camps, there are those whose members are either infirm or aged or otherwise incapacitated or consist of women who have no able bodied men to look after them.

These constitute what is known as æPermanent Liability" of Government. Total number of persons in this category in September 1957 was 54066".

5. Rabi Da, Nabaganga Theke Adiganga, Bhuinfonrder Suluk-Sondhan : Probo-Ek, Internet Source : http://bangalnama.wordpress.com/2010/09/13/nabaganga-theke-adiganga-1/
6. Ishita Dey, 'On the Margins of Citizenship: Principles of Care and Rights of the Residents of theRanaghat Women's Home, Nadia District', Web Article, http://www.mcrg.ac.in/rw%20files/RW33/1.On_the_Margins_of_Citizenship.pdf. Last accessed on 22.04.2011.
7. Ishita Dey, Ibid, Last accessed on 22.04.2011.
8. Ishita Dey, Ibid, Last accessed on 22.04.2011.
9. Harinarayan Adhikary (Ed.), Ibid, 1995, Kolkata, p. 18.
10. Interview of Mr. Dilip Chaki, Dilip Chaki resides at Taherpur, Nadia. Date of taking the interview: 9th April, 2010.
11. Interview of Mr. Dilip Chaki, Ibid.
12. Interview of Mr. Dilip Chaki, Ibid.
13. Interview of Mr. Dilip Chaki, Ibid.
14. Census of India, 1961.
15. Harinarayan Adhikary (Ed.), Ibid, 1995, Kolkata, p. 28.

Subhas Biswas
Associate Professor,
Dept. of History,
University of Kalyani, Nadia

Green Accounting, Its Reporting Practices and the Sustainable Development Goals : An Indian Perspective

Somnath Bandyopadhyay

Abstract

This article attempts to find out whether the green accounting is interlinked with the sustainable development goals, which promise to build a more prosperous, equal and more secured World by 2030.and the present green accounting and reporting practices prevailing in India are consistent with the same. Based on secondary data it has been found that though the green accounting is linked with the sustainable development goals, the prevailing accounting practices in India are at developing stage and there is lack of effectiveness of the same.

I. Introduction :

Economic development without environmental consideration creates environmental degradation. Rapid expansion of industries throughout the globe is the major factor for environmental crisis. Industrialization without environmental consideration adversely affects the eco-system and definitely goes against the spirit of sustainable development (Das, 2017). Therefore, consideration of ecological consequences while establishing industrial units should be the major concern to ensure sustainability of this planet. In the international arena, the issue has been discussed continuously since late sixties. During the period 1968 to 1972 two international conferences held to assess the problem relating to environmental issues and to find out the appropriate corrective actions (Manglant, 2016). The UN conference on human and environment (Stockholm Conference), held in June, 1972, may be considered as pivotal event in the area of global environmental movement.

On the other hand, accounting is a multi-purposive concept, which deals with presentation of relevant accounting information so as facilitate its users to arrive at the appropriate decision about the state of affairs of the entity. However, conventional accounting system does not consider any disclosure pertaining to the environmental issues. The financial statements can effectively consider problems like pollution of air, water, land and degradation of environment, health of the workers, etc., along with internal costs while calculating the profit or loss (Kumar et.al 2016). In this backdrop, Green Accounting may be considered as the significant tool to meet the environmental concerns of the entity. Green Accounting, which is also known as environmental accounting, is a type of accounting that attempts to consider the environmental costs into financial results of the entity. Peter Wood first brought the term into use in the year 1980 (Jolly, 2014). It is a significant management tool used for variety of purposes, such as

Bandyopadhyay, Somnath : Green Accounting, Its Reporting Practices and the Sustainable Development Goals : An Indian Perspective

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 1, June 2020, Page : 66-76, ISSN 2249-4332

improving environmental performance, investing in 'cleaner' technologies and developing 'greener' process and products. It is also a growing field that identifies use of resources and its potential impact on the environment (Solanki, 2016). Like other parts of this Globe, developing countries like India twin problem of economic development coupled with protection environment is a major cause of concern. Therefore, a tradeoff between environmental protection and economic development is highly significant for sustainable development of the country. India has also played a fundamental role to shape Sustainable Development Goals (SDGs), which has been adopted by the United Nations to bring a more prosperous World by the year 2030 (KPMG, 2017). Thus effective disclosure of Green Accounting information is highly significant towards achievement of Sustainable Development.

Thus, an attempt has been made in this article to review the state of Green Accounting and Reporting Practices of Indian Corporate in the light of sustainable development. We have divided this article in six sections. In section II, we present a brief literature survey and we present our objectives and methodology of work in section III. Section IV tries to find out inter linkage between Green accounting and Sustainable Development Goals (SDGs) and in section V we analyse Green Accounting Practices prevailing in India and finally, in chapter VI we have made some concluding observations.

II. Review of Literature :

Green Accounting has significant bearings upon meeting SDGs in order to ensure a more resilient, more prosperous and secured world by 2030. Radermacher (1999) on the basis of secondary data found that since few large production sector are responsible for green house gases and acidification of airs in Germany, environmental accounting may be used as a significant vehicle to connect their cumulative emission with their economic value added at market price and gross output. Gray and Babington (2001) based on their experiences from different countries in the world found that financial statements within the GAAP are designed to communicate all the material information to the stakeholders, thus environmental issues, which may significantly affect the future value of the firms must be included within the same. They have also found that in spite of its importance the proportion of large and medium size corporations mentioning environmental issues in their financial statements are very low outside USA. Shill (2013) based on secondary data found that in India Gross Domestic Products ignore the environmental and therefore decision makers need a revised model that incorporates the green accounting. Minimol and Makesh (2014) on the basis of primary as well as secondary data and by using the technique of factor analysis found that environmental accounting in India is still at infant stage. They have also argued that although the Indian firms have been complying with the rules and regulations regarding environmental protection, but due to absence of any clear cut policies at the national , state and company level regarding the same the environmental reporting of Indian firms are yet to be reached the desired level. They have advocated that there must be six important aspects to be covered by the environmental reporting of the firms.

Jolly (2014) on the basis of secondary data found that Green Accounting must be viewed as a dynamic process rather than one time activity. It significantly leads to more informative decisions of the business and political managers. On the basis of secondary data, Ranga and Garg (2014) found that Environmental Accounting and Reporting in India are still at the initial stage and whatever may be reported in the financial statements are more or less in conformity with the significant rules and regulations of the concerned Acts. Muninarayanappa and Amaladas (2014) on the basis of secondary as well as primary data advocated that despite limitations of the conventional double entry system to quantify the environmental degradation in terms of money, inclusion of the environmental accounting in the University curriculum in different countries in general and in India in particular have paved the way to future accountants to measure the environmental degradation in quantitative terms. Chakladar and Gulati (2015) on the basis of primary data and using some statistical techniques like regression analysis found that in order to maintain existence in global market Indian firms have been adopting the environmental reporting seriously irrespective of their domestic or multinational status or earning capacities. Prakash (2016) on the basis of study of annual reports of 85 Indian Companies found that Indian companies are voluntarily reporting their environmental accounting practices in a positive manner only and for that purpose he tried to highlight some important suggestions e.g. framing environmental strategy at organizational level , making environmental accounting mandatory etc. Maglani (2016) found that though environmental reporting has become an integral part of financial reporting of Indian Corporate Houses, but the lack of objectivity has been found to basic shortcomings of the same. Das (2017) found that despite environmental reporting on the part of Indian Corporate houses are in compliance with the provisions of the Companies Act, there are clear deficiencies in the objectivity of the same. He used secondary data source of the study. Kumar et al (2016), Malik and Mittal (2015), Archana (2017) also argued the same opinion on the issue. Solanki (2016) on the basis of secondary data found that since India is big country and there are several problems of environmental hazards, Green Accounting may be implemented as an effective tool to ensure green economy of the country. Prasad (2017) on the basis of study on automobile industry in India found that BMW group occupies the top position in adopting green accounting initiatives. He also mentioned that as the measures of sustainability the company has started to produce e-vehicles and vehicles run by hydrogen fuel. Prathima (2017) on the basis of secondary data found that green accounting can be served as the backbone for integrated sustainable development and growth of the nation. But so far as the disclosures are practiced by the Indian corporate, they are not providing full information about the same and that information in some cases suffer from lack of proper quantitative figures. That is why she urged for appropriate mandatory disclosure regulations for the same. Ray (2017) on the basis of secondary data also found that in the current scenario when environmental pollution has become major challenge, a well defined environmental accounting policy is the need of the hour for sustainable development of the nation. They also argued that despite that importance the environmental accounting and reporting prevailing at

the introductory stage in India. Laxshmi and Devi (2018) on the basis of secondary data found that since environmental accounting is a significant tool to understand the effects of the physical environment on the economy as a whole, a definite environmental policy and its proper implementation as well as proper accounting policies must be formulated in order to ensure sustainable development of the country. Okegbe et al (2019) on the basis of primary data collected from Nigeria found that although the Environmental Management Disclosure does not have significant positive relation with the profitability as well as return on assets, but the same is significantly and positively related with the size of the firm. Thus, they advocated for disclosure of environmental practices to the stakeholders, inclusion of environmental and social agenda into the corporate strategy and tax credit to the firm for complying with environmental laws. Dhanyashree (2019) on the basis of secondary data found that being an innovative measure green accounting practices help to prevent exploitation of our eco system and thus leads to sustainable development.

We may sum up the survey of literature by inferring that some of the studies have dealt with Green Accounting as a suitable measure to combat environmental hazards and to maintain our ecosystem and some other studies have dealt with shortcomings of existing financial reporting practices prevailing in the world. Moreover some the studies exhibit the fact that though in India corporate houses are reporting the environmental issues in compliance with the regulatory norms, those reporting suffer from lack of objectivity due absence of specific disclosure policies regarding the same. In spite of the availability of good number of studies, we have not come across studies highlighting importance of India's prevailing Green Accounting Practices for achieving SDGs. There are very few studies which deal with present position of Green Accounting practices of Indian Corporate houses from which we may draw a clear cut conclusion about the same.

III. Objectives and Methodology :

After reviewing the concerned literature, the present study attempts to find the answer to the following research questions:

1. Does Green Accounting has a positive impact on the SDGs?
2. Is the present Green Accounting Practices prevailing in India consistent with the SDGs?

We have based our study on available secondary data only. For this purpose, we have used different book, journals published by different Indian as well as International authors. For the purpose of analysis of result, we have used simple statistical tools like arithmetic mean, standard deviation and coefficient of variation. For testing statistical significance of our result, we have used Fisher's 'paired t' test.

IV. Green Accounting and Sustainable Development Goals :

The Sustainable Development Goals (SDGs) aim to build a more prosperous, more equal and more secured World by 2030. The 2030 Agenda and its 17 SDGs with 169 targets, adopted in 2015 by 193 countries, provide a coherent and holistic framework for addressing

the problems that have endured through the past decades and reflects our evolving understanding of the social, economic and environmental linkages that define our lives. According to their definition, Sustainable Development is a combination of five Ps, contains a plan of action for people, planet, prosperity, peace and partnership (United Nations, 2015). It recognizes that at present climate change is one of the greatest challenges and its adverse impacts are posing threats to all the countries to achieve sustainable development. India has a fundamental role in shaping the SDGs and the country's national development agenda is mirrored in the SDGs (KPMG, 2017).

On the other hand Green Accounting tries to encompass the environmental costs into the financial results of the enterprise. It attempts to highlight the environmental costs, which may be hidden in overhead costs or otherwise overlooked, resulting in better utilization of available resources (Jolly, 2014). Its objective shows that if properly followed it may yield very positive result in achievement of sustainable development. We have presented the SDGs as set in 2030 agenda, which may be achieved by the proper Green Accounting practices in Table-1.

Table 1 : Inter linkage between Sustainable Development Goals and Green Accounting

Goal	SDGs	SDG indicators	Objectives of Green Accounting
6	Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all	6.3 By 2030 improve water quality by reducing pollution and eliminating dumping and minimizing use of hazardous chemimcals and materials……. 6.4 By 2030 substanatially increase water-use efficiency accross all sectors……..	Ensure minimization of water pollution, air pollution, voice pollution and the problem of solid waste.
13	Take urgent action to combat climate change and its impacts	13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards.....	Measure ecological ability of the firm.
14	Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development	14.3 Minimize and address impacts of ocean acidification…….	Minimize marine and coastal pollution

Source : KPMG (2017), Ranga & Garg (2014),Das(2017).United Nations (2015).

From Table-1 it may be argued that Green Accounting, which aims at minimization of environmental hazard, caused by the different activities of firm, by means of appropriate measurement of environmental costs and benefits has close relationship with as many as three sustainable development goals and four sustainable development goal indicators. Thus, if properly implemented at the enterprise level, the Green Accounting will have positive impact on the achievement of sustainable development goals.

V. Green Accounting Practices in India :

From the preceding section it is well understood that proper implementation of green accounting may lead to very significant result towards achievement of sustainable development goals. Now in this section we proceed to highlight the present scenario of green accounting practices in India with the help of secondary data. In India the Article 12 of the Indian Constitution confers the rights of the citizens the life and liberty, which has resulted enactment of various legislation relating to the environmental and ecological protection of the country (Basu, 2005). As such, much legislation has been enacted by the Government of India since independence (Shil, 2013, Prakash, 2016). These are given as under :

1. Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;
2. Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1977;
3. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;
4. The Forest (Conversation) Act, 1980;
5. The Environment (Protection) Act, 1986;
6. Article 51A in Part-IV of Indian Constitution;
7. The Factories Act, 1948;
8. The Hazardous Waste (Management & Handling) Rules, 1989;
9. The Public Liability Insurance Act, 1991;
10. The Motor Vehicles Act, 1991;
11. Indian Fisheries Act, 1987;
12. The Merchant of Shipping Act, 1958;
13. The National Environment Tribunal Act, 1995

Those apart, Cost Accounting Standard (CAS)-14, issued by the Institute of Cost and Works Accountants of India, deals with the principles and methods to be followed in classification, measurement and assignment of pollution control costs , for the purpose of determination of cost of product or service and disclosure in the cost statements (ICWAI, 2015). The standard is applicable for the cost statements, which require classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of pollution control costs including those require attestation.

Despite a plethora of legislations to ensure environmental concern on the part of corporate houses in practice there has been very wide range of variations among the same regarding disclosure of relevant information. Moreover it is a fact that in most of the cases whatever may be shown in the accounts is more or less compliance of the relevant rules and there is

very little effectiveness of such disclosure (Archana 2017; Prathima 2017).

Now, the practices, which are followed by Indian Corporate houses towards green accounting, may be highlighted in terms 15 important environmental parameters. For that purpose we may classify the companies into two categories viz. manufacturing and non-manufacturing.

Table 2 : Extent to which Indian Corporate Houses practice voluntary Green Accounting Reporting

Sl.no.	Parameters	Manufacturing (12)		Non-manu-facturing (13)		Total (25)	
		Yes (%)	No (%)	Yes (%)	No (%)	Yes (%)	No (%)
1	Environmental Policy	75.00	25.00	76.92	23.08	76.00	24.00
2	Health Safety and Environment	91.67	8.33	69.23	30.77	80.00	20.00
3	Energy Conservation	75.00	25.00	61.54	38.46	68.00	32.00
4	Corporate Sustainability/ Environmental Initiative	83.33	16.67	84.62	15.38	84.00	16.00
5	Sustainability Reporting	41.67	58.33	30.77	69.23	36.00	64.00
6	Waste Management	83.33	16.67	38.46	61.54	60.00	40.00
7	Water Management	75.00	25.00	46.15	53.85	60.00	40.00
8	Wind/renewable energy sources	58.33	41.67	15.38	84.62	36.00	64.00
9	Environmental Information System	91.67	8.33	30.77	69.23	76.00	40.00
10	Environmental Disclosure Practices	41.67	58.33	46.15	53.85	44.00	56.00
11	Environmental targets	0	100.00	69.23	30.77	40.00	60.00
12	Environmental reporting indicators	75.00	25.00	76.92	23.08	76.00	24.00
13	Environmental costs and benefits	0	100.00	0	100.00	0	100.00
14	Environmental liabilities	0	100.00	0	100.00	0	100.00
15	Environmental Assets	0	100.00	0	100.00	0	100.00

Source : Minimol and Makesh, 2014

Fig 1 : Comparison of Manufacturing and Non-manufacturing sectors in terms of Voluntary Environmental Reporting

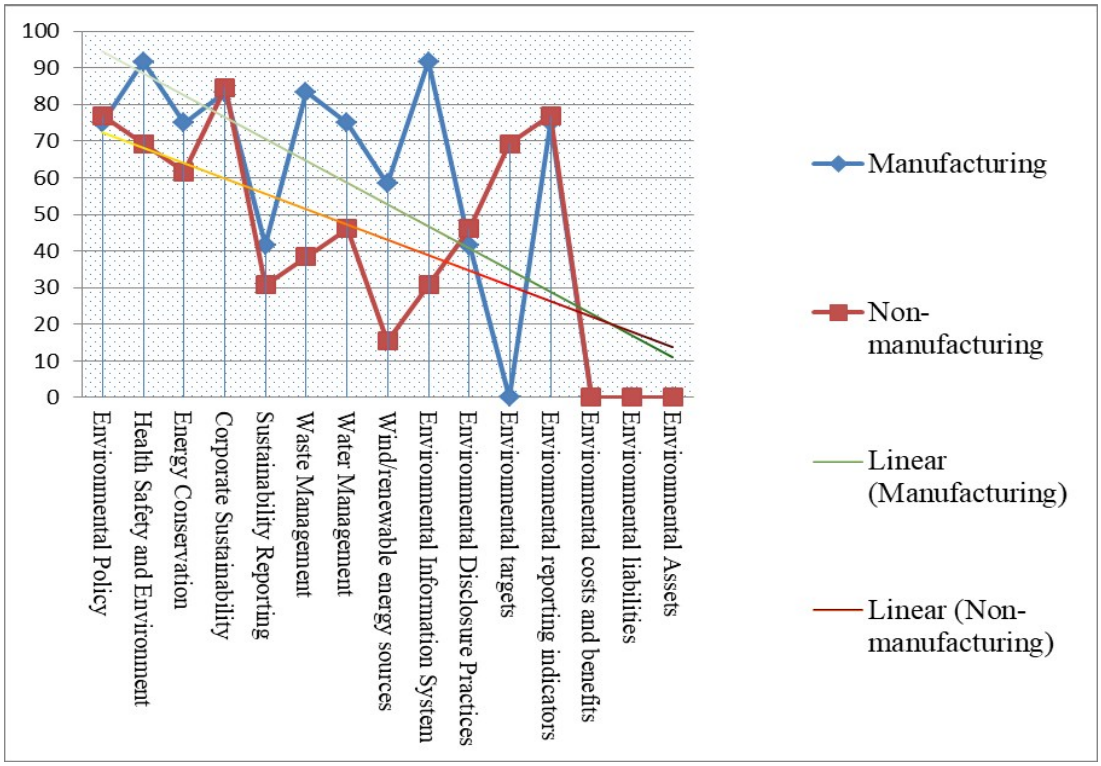

Source : Ibid.

From table 2 and figure 1 it is revealed that in the matter of environmental reporting manufacturing sectors are mostly concerned with environmental policy, health safety and environment, energy conservation, corporate sustainability, waste management, water management, environmental information system and environmental reporting indicators. On the other hand, non-manufacturing sectors are mostly concerned with environmental policy, corporate sustainability and environmental reporting indicators only. Again in case manufacturing sector maximum weights has been given on Health safety and environment (91.67%) and the same in case of non-manufacturing sectors has been given on corporate sustainability (84.62%). In case of manufacturing sectors nothing has been reported regarding environmental targets, environmental costs and benefits, environmental assets and liabilities. Again in case of non-manufacturing sectors nothing has been reported regarding environmental costs and benefits as well as environmental assets and liabilities. However, figure 2 also indicates that overall reporting practices of manufacturing sectors are somehow better than that in non-manufacturing sector. Thus table 2 and figure 1 show a mixed picture regarding the state of Green Accounting and Reporting practices in India. Now, the statistical results Green House Reporting of manufacturing

as well as non-manufacturing sectors may be highlighted from the following tables :

Table 3 : Statistical results of Green Accounting Reporting Practices in India

Sectors	Mean	S.D.	C.V
Manufacturing Sectors	52.78	36.14	68.5
Non-manufacturing Sectors	43.08	29.76	69.01

Source : Calculated from table 2

Table-3 indicates that mean coverage of reporting parameters of manufacturing sectors are somehow better than that in non-manufacturing sectors, which confirms our observation in last part of this section. On the other hand, it revealed that degree variation in terms of using parameters for Green Accounting Reporting is more in case of non-manufacturing sectors. However, by applying Fishers' 'paired t' test it has also been found that the said difference is not statistically significant (Table 4). Thus, our analysis shows that although apparently in terms of the parameters for Green Accounting Reporting manufacturing sectors are better than non-manufacturing, but statistically there is significant difference between two sectors.

Table 4: Fisher's 'paired t' test result for comparison of manufacturing sectors and non-manufacturing sectors

H_o	H_1	N	DF	Calculated 't' value	Pr(T < t)	Pr(|T| > |t|)	Pr(T > t)
$\mu_2 = \mu_1$	$\mu_2 \neq \mu_1$	15	14	1.2519	0.8844	0.2311	0.1156

Note : μ_1 and μ_2 indicate means for manufacturing sectors and non-manufacturing sectors respectively. N indicates Number of observations, DF indicates degrees of freedom. Pr (T < t) indicates left tailed test, Pr (|T| > |t|) indicates both tailed test, Pr (T > t) indicates right tailed test.

Source : Calculated from table 2

VI. Concluding Observations :

Green Accounting is no doubt an innovative measure to ensure environmental aspects within the activities of the entity. If it is implemented by letter and spirit, it may yield very positive result in reducing environmental concerns. There is also close linkage between green accounting and sustainable development goals, which promise to a more prosperous, more equal and more secured World by 2030. In this context, we have noted that there is much legislation concerning environmental issues. Moreover, there is also a cost accounting standard regarding the issue. But so far our studies are concerned it may be asserted that in most of the cases Indian Corporates follow green accounting and reporting practices only in compliance with the statutory requirements. It is also evident that though graphically it may be shown that

manufacturing sectors are standing at a better position than the non-manufacturing sectors; statistically there is no significant difference between the two sectors, which indicates very little effectiveness of the practices, which are being currently followed by the Indian Corporate. Moreover, there are some important areas e.g. environmental costs and benefits, these still now which are outside purview of the reporting practices. Thus, it may be concluded that green accounting and reporting practices in India are at developing stage and a clear cut policy regarding the same both at the company level as well at the government level is the need of the hour to have the full potentials towards sustainable development.

References :

Archana, T. A (2017), 'Green Accounting and Reporting among Indian Companies', International Journal of Trend in Scientific Research and Development, Vol. 1 (6), PP. 1006-1012.

Basu, D. D (2005), Introduction to the Constitution of India, 19th edition, Wadhwa & Company, Nagpur.

Chaklader, B & Gulati, P.A. (2015), 'A Study of Corporate Environmental Disclosure Practices of Companies Doing Business in India', Global Business Review, Vol. 16 (2), PP. 321-335.

Das, P.K. (2017), 'An Introduction to the Concept of Environmental Accounting and Reporting-Indian Scenario', Imperial Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 3 (4), PP. 13-22.

Govt. of India (2002), Environmental Accounting Guidelines. Ministry of Environment.

Gray, R & Bebbington, G (2001), 'External Reporting and Auditing II: Environmental Reporting Outside the Financial Statement' in Accounting For Environment, SAGE Books, accessed from http://dx.doi.org/10.4135/9781446220849.n12, 26.04.2020.

Institute of Cost and Works Accountants of India (2015), CAS-14, Cost Accounting Standard on Pollution Control Cost, PP. 1-18.

Jolly, L (2014), 'Green Accounting-A Way to Sustainable Development', Sai Om Journal of Commerce and Management, Vol. 1 (5), PP. 44-47.

KPMG (2017), Sustainable Development Goals (SDGs) : Leveraging CSR to Achieve SDGs, Global Compact Network India, retrieved from https://assets.kpmg.comcontentdamkpmginpdf201712SDG_New_Final_Web.pdf on 04.11.2018 at 10.58 am.

Kumar, et.al. (2016), 'Towards Green Accounting : Effective Tool for Sustainable Development', International Journal of Applied Research, Vol. 2 (12), PP. 604-607.

Lakshmi , V. V. & Devi, K.S (2018), 'Environmental Accounting and Reporting Practices in India-Issues and Challenges', International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology, Vol. 6 (II), PP. 1819-1825.

Malik, P & Mittal, A (2015), ' A Study on Green Accounting Practices in India', Vol. 4 (6), International Journal of Commerce, Business and Management, Vol. 4 (6), PP. 779-787.

Manglani, B (2016), 'A Study on Environment Accounting Practices in Indian Corporate Units', International Journal of Commerce and Management Research, Vol.2(12), PP. 62-65.

Minimol, M. C & Makesh K.G. (2014), 'Green Accounting and Reporting Practices Among

Indian Corporates', Asia Pacific Journal of Research, Vol. I (XIV), PP. 21-35.
Muninarayanappa, M. M. & Amaladas, L.A. (2014), 'Environmental Accounting : A Curriculum Model to Indian Academia', European Scientific Journal, Vol. 2 (S), PP. 262-273.
Okegbe et.al. (2019), 'Environmental Management Reporting and Corporate Performance: Evidence from Natural Resources, Agriculture, Oil and Natural Gas Firms in Nigeria', International Journal of Trend in Scientific Research and Development, Vol. 3 (5), PP. 2206-2211.
Prakash, N (2016), 'Environmental Accounting in India - A Survey of Selected Indian Industries', Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Vol. 6 (7), PP. 1690-1705.
Prasad, D.T. (2017), 'Green Accounting Practices in BMW Group', International Journal of Management and Commerce, Vol. 4 (10), PP. 108-115.
Radermacher, W (1999), 'Indicators, Green Accounting and Environment Statistics-Information Requirements for Sustainable Development', International Statistical Review, Vol.67(3), PP. 339-354.
Ranga, S & Garg, R (2014), 'Legal Framework for Environmental Accounting in India', International Journal of Management and Social Science Research, Vol. 3 (6), PP. 01-03.
Ray, D (2017), 'Environmental Accounting-Necessity in this Dynamic Business Environment', Harvest, Vol. 21-42.
Shil, P (2013), 'Forms and Legal Framework of Environmental Accounting in India', International Journal of Scientific Research. Vol. 2 (6), PP. 88-89.
Solanki, A (2016), 'A Study About Green Accounting : Its Importance And Concept', Abhinav National Monthly Referred Journal of Research in Commerce and Management, Vol. 5 (6), PP. 01-07.
United Nations (2015), Transforming World : The 2030 Agenda for Sustainable Development, retrieved from https://sustainabledevelopment.un.orgcontentdocuments21252030%20Agenda%20for%20 Sustainable%20Development%20web.pdf on 04.11.2018 at 11.37 am.

Somnath Bandyopadhyay
Assistant Professor in Commerce,
Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya,
Majdia, Nadia, West Bengal

ISSN: 2249-4332

Information to the Contributors

1. The length of the article should not normally exceed 5000 words.
2. Two copies of the article on one side of the A4 size paper with an abstract within 150 words and also a C.D. containing the paper in MS-Word should be sent to the Editor or by e-mails.
3. The first page of the article should contain title of the article, name(s) of the author(s) and professional affiliation(s).
4. The tables should preferably be of such size that they can be composed within one page area of the journal. They should be consecutively numbered using numerals on the top and appropriately titled. The sources and explanatory notes (if any) should be given below the table.
5. Notes and references should be numbered consecutively. They should be placed at the end of the article, and not as footnotes. A reference list should appear after the list of notes.
   It should contain all the articles, books, reports are referred in the text and they should be arranged alphabetically by the names of authors or institutions associated with those works. Quotations must be carefully checked and citations in the text must read thus (*Coser 1967, p. 15*) or (*Ahluwalia 1990*) and the reference list should look like this :
   1. Ahluwalia, I. J. (1990), 'Productivity Trend in Indian History : Concern for the Nineties', Productivity, Vol. 31, No. pp 1-7.
   2. Coser, Lewis A (1967), 'Political Sociology', Herper, New York.
6. Book reviews and review articles will be accepted only for an accompanied by one copy of the books reviewed.
7. The author(s) alone will remain responsible for the views expressed by them and also for any violation of the provisions of the Copy Rights Act and the Rules made there under in their articles.

Our Ethics Policy : It is our stated policy to not to take any fees or charges in any forms from the contributors of articles in the Journal. Articles are published purely on the basis of recommendation of the reviewers.

For Contribution of Articles and Collections of copies and for any other Communication please contact

Executive Editors
OPEN EYES
S.R.Lahiri Mahavidyalya ,
Majdia , Nadia-741507, West Bengal, India,
Phone-03472-276206.
bhabesh70@rediffmail.com, shubhaiyu007@gmail.com,
srlmahavidyalaya@rediffmail.com
Please visit us at : www.srlm.org

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 17, No. 1, June 2020

Published by :
S.R.L. Mahavidyalaya, Majdia, Nadia, West Bengal, India.
Printed by :

Price : One hundred fifty only